৭.২০ মৃত্যুকূপে দস্যু বনহুর – Bangla Library

৭.২০ মৃত্যুকূপে দস্যু বনহুর – Bangla Library

৭.২০ মৃত্যুকূপে দস্যু বনহুর

মৃত্যুকূপে দস্যু বনহুর–১২০

রাণী দুর্গেশ্বরী আর বনহুর চমকে না উঠলেও কিছুটা হতভম্ব হলো। তারা দাঁড়িয়ে পড়েছিলো, এবার আবছা অন্ধকারে ভালভাবে লক্ষ্য করলো সৈনিকদ্বয়কে।

একটা তীব্র আলো এসে পড়লো বনহুর আর রাণী দুর্গেশ্বরীর মুখে।

এবার সৈনিকদ্বয়ের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো ঝামরাণীর দেহরক্ষীবেশী বনহুরের ওপরে। সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকদ্বয় অস্ত্র নামিয়ে নিয়ে কুর্ণিশ জানালো।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো–তোমরা নিজ কর্তব্য পালন করে যাও। আমার ওপর রাণীজীর নির্দেশ, রাণী দুর্গেশ্বরীকে তার আস্তানায় পৌঁছে দিতে হবে।

পুনরায় সৈনিকদ্বয় পথ ছেড়ে সরে দাঁড়িয়ে কুর্ণিশ জানালো।

বনহুর দুর্গেশ্বরীকে লক্ষ্য করে বললো–চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। রাত ভোর হবার পূর্বে আমাকে আবার রাজপ্রাসাদে ফিরে আসতে হবে।

দুর্গেশ্বরী সৈনিকদ্বয়ের মুখে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলতে শুরু করলো।

সৈনিকদ্বয় চলে গেলো তাদের কর্তব্যকাজে।

ওদের মনে একটা সন্দেহ জাগলো, গভীর রাতে ঝামরাণী রাণী দুর্গেশ্বরীকে মুক্তি দিলেন এবং তাকে তার আস্তানায় পৌঁছে দেবার জন্য তার প্রধান দেহরক্ষীকে দায়িত্ব দিয়েছেন–ব্যাপার কি?

ভোর হবার পূর্বেই ওরা দুজন রাজপ্রাসাদে গিয়ে হাজির এবং তারা এ সংবাদ রাজপ্রাসাদের প্রধান রক্ষীকে জানালেন।

প্রধান রক্ষী বললো–যা শুনেছো তা সত্যি। রাণীজী নিজে রাণী দুর্গেশ্বরীকে মুক্তি দিয়েছেন।

এরপর আর তাদের প্রশ্ন করার কিছু থাকে না। তারা চলে যায় নিজ কাজে। তবু তাদের মনে বিস্ময় জাগে, রাণী কেন দুর্গেশ্বরীকে মুক্তি দিলেন।

রাণী দুর্গেশ্বরীকে এভাবে মুক্তি দেয়ায় সবার মনেই নানা প্রশ্ন জাগলো। প্রজাগণ নানা জনে নানা ধরনের মতবাদ প্রকাশ করতে লাগলো। হঠাৎ রাণীজীর

হলো কি, তিনি রাণী দুর্গেশ্বরীকে কেনই বা বন্দী করে আনলেন আবার কেনই বা মুক্তি দিলেন–কিন্তু এই প্রশ্নের জবাব কেউ পেলো না।

প্রজাগণ অবশ্য মনেপ্রাণে খুশি হয়েছে, কারণ তারা কেউ চায়নি রাণী দুর্গেশ্বরীর কোনো অমঙ্গল হোক। ঝম রাজ্যের অসহায় মানুষগুলো তার দানে বেঁচে আছে। যারা পঙ্গু অন্ধ বৃদ্ধ অকর্মণ্য তারা রাণী দুর্গেশ্বরীর বন্দী হবার কথা শুনে খুবই চিন্তিত ব্যথিত মর্মাহত হয়ে পড়েছিলো, এমনকি তারা আহার–নিদ্রা ভুলে গিয়েছিলো। কেন ঝামরাণী দেবী সমতুল্যা রাণী দুর্গেশ্বরীকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলো তাও তারা জানে না। আজ সবাই খুশিতে আত্মহারা–দুর্গেশ্বরী মুক্তি পেয়েছে।

রাণী দুর্গেশ্বরী তার আস্তানায় ফিরে এসে আবার তার ধনাগারের দ্বার মুক্ত করে দিলো। ঝামবাসীদের মধ্যে যারা অসহায় গরিব পঙ্গু বৃদ্ধ অন্ধ তারা আবার দলে দলে চললো ঝামজঙ্গল অভিমুখে। রাণী দুর্গেশ্বরী দুহাত ভরে সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছিলো অর্থ, বস্ত্র, এবং খাদ্য।

বনহুর পাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিলো।

দুচোখে তার বিস্ময়, রাণী দুর্গেশ্বরীর মহত্ত্ব তাকেও হার মানায়, গরিব অসহায় মানুষগুলোর মধ্যে দুর্গেশ্বরী হারিয়ে যায় একাত্ম হয়ে। একসময় দান শেষ হয়, দুর্গেশ্বরী ফিরে আসে তার আস্তানার বিশ্রামকক্ষে।

বনহুর এবার বিদায় চায় তার কাছে।

দুর্গেশ্বরী বলে–দস্যুসম্রাট, তোমার ওপর আমার কোনো অধিকার নেই। তুমি আমাকে উদ্ধার করে আনলে, তার বিনিময়ে আমি তোমাকে কিছু দিতে চাই। যদি গ্রহণ না করে তাহলে আমি ভীষণ দুঃখ পাবো। শুধু এই বার নয়, এর পূর্বেও আমাকে মৃত্যুগহ্বর থেকে উদ্ধার করেছিলে কিন্তু কেন তুমি বারবার আমাকে এভাবে রক্ষা করছো?

এর জবাব আমি তোমাকে দিয়েছি দুর্গেশ্বরী। মানবতার খাতিরে আমার কর্তব্য পালন করেছি।

না, আমি তা বিশ্বাস করি না।

কেন? হেসে বললো বনহুর।

দুর্গেশ্বরী বললো–তুমি সত্যি করে বলে আমাকে তুমি বিশ্বাস করো?

আমার সম্পর্কে তোমার মনে দুর্বলতা থাকা উচিত নয় দুর্গেশ্বরী।

সত্যি তুমি আমাকে ভালবাসো বনহুর?

এর জবাব তোমার নিজের মনের কাছেই পাবে।

বনহুর!

দুর্গেশ্বরী, আমার বিদায়ের সময় হলো, কারণ আমার জন্য আমার সহচর রহমান ঝাম সাগরের গভীর তলদেশে ডুবুজাহাজ উল্কার মধ্যে অপেক্ষা করছে।

তুমি চলে যাবে বনহুর?

যদি বিদায় দাও।

আমার ক্ষুদ্র উপহার তোমাকে নিতে হবে।

দাও।

সত্যি নেবে?

নেবো, যা দেবে আমি নেবো দুর্গেশ্বরী।

দুর্গেশ্বরী চলে গেলো তার বিশ্রামকক্ষে পাশের ছোট কুটিরটির মধ্যে। একটু পরে ফিরে এলো ছোট্ট একটি বাক্স নিয়ে, বনহুরের হাতে দিয়ে বললো–এই নাও আমার ক্ষুদ্র উপহার। যা আমি যত্ন করে রেখেছিলাম তোমায় দেবো বলে।

বনহুর বাক্সটা খুলতে যাচ্ছিলো।

দুর্গেশ্বরী বললো–না, ওটা তুমি আজ খুলতে পারবে না, যখন আমার কথা তোমার স্মরণ হবে তখন তুমি ওটা খুলবে।

বেশ, তোমার কথা আমি রাখবো।

বনহুর দুর্গেশ্বরীর কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। তার দেহে তখনও ঝামরাণীর দেহরক্ষীর ড্রেস পরিহিত আছে। বনহুর যখন ঝামজঙ্গল অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছিলো তখন হঠাৎ তার চারপাশে ফিরে দাঁড়ালো বিশ–বাইশ জন অস্ত্রধারী ঝামসৈন্য।

সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিলো বনহুর।

সে ভাবতেও পারেনি হঠাৎ এভাবে সে আক্রান্ত হবে।

বনহুর তাদের দেখেই চিনতে পারলে তারা ঝামসৈন্য। ওরা অস্ত্রের মুখে বনহুরকে বন্দী করে ফেলল। ভাগ্যিস, বনহুর রাণী দুর্গেশ্বরীর দেওয়া ছোট্ট বাক্সটা তার নিজ পোশাকের গোপন পকেটে রেখে দিয়েছিলো তাই ওরা ওটা খুঁজে পেলো না।

ঝামরাণীর সম্মুখে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে এটাই ভেবেছিলো বনহুর কিন্তু তাকে ঝাম রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হলো না, তাকে তারা এক অদ্ভুত বাড়ির অভ্যন্তরে নিয়ে গেলো। বনহুর দেখলো এই সৈন্যদলটিকে পরিচালনা করছে ঝামরাণীর একজন দেহরক্ষী। এই ব্যক্তিটিকে বনহুর বন্দী করে তার পোশাক পরেই রাণী দুর্গেশ্বরীকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলো।

বনহুর তাকে যেমন চিনতে পারে দেহরক্ষীটিও বনহুরকে চিনে নিয়েছিলো। ঝামরাণীর দুর্বলতা তার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিলো, তাই বনহুরকে গ্রেপ্তার করার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে দেহরক্ষীটি। সে গোপনে অনুসন্ধান চালায় কয়েকজন সঙ্গী–সাথী নিয়ে। অবশ্য এ ব্যাপারে মোটেই জানে না ঝামরাণী।

অনুচরটির যত রাগ বনহুরের ওপর, সে ঝামজঙ্গলে সঙ্গীদের নিয়ে আত্মগোপন করেছিলো এবং বনহুরকে তারা গভীরভাবে লক্ষ্য করছিলো।

রাণী দুর্গেশ্বরীর কাছে বিদায় নিয়ে যখন বনহুর চলে এলো তখন এই দলটি গোপনে তাকে অনুসরণ করলো, এবং বনহুর যখন রাণী দুর্গেশ্বরীর সীমানা পেরিয়ে বহু দূরে চলে এলো তখন তাকে আচমকা আক্রমণ করে ঘিরে ফেললো ঝামরাণীর প্রধান দেহরক্ষী মতিলাল।

বনহুরকে ওরা যখন গ্রেপ্তার করলো তখন বনহুর মোটেই প্রস্তুত ছিলো না, আর প্রস্তুত ছিলো না বলেই মতিলাল তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলো। অদ্ভুত সেই পোড়োবাড়ি যে বাড়িতে বনহুরকে নিয়ে আসা হলো। বন্দী করার পর বনহুরের দুচোখ বেঁধে নিয়ে আসা হলো।

যখন বনহুরের চোখ খুলে দেয়া হলো তখন সে দেখলো বাড়িখানার আসল রূপ। পোড়োবাড়ি কিন্তু বাড়িখানা কোনো কালে রাজপ্রাসাদ ছিলো। আজ সেই প্রাসাদের সৌন্দর্য নেই, আছে তার জরাজীর্ণ কংকাল। প্রাসাদের ভগ্নস্তূপের ওপরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে নানা ধরনের জংলী গাছ–গাছড়া। বট আর অসংখ্য বৃক্ষ আসন গেড়ে বসেছে সন্ন্যাসী বাবাজীর মত। তার শিকড়গুলো জটাজুটের মত ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে।

বনহুরের চোখের বাধন খুলে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। তখন বাড়িখানার কংকালসার জরাজীর্ণ অবস্থা হলেও একদিন এ বাড়ির জৌলুস ছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সিংহদ্বার, রাজদরবার, রাজঅন্তপুর সব ধ্বংসাবশেষে পরিণত হলেও তার ঐতিহ্যবাহী কংকালখানা সেদিনের ইতিহাস বহন করছে।

বনহুরকে একটি ভগ্নস্তূপের পাশে নিয়ে আসা হলো। চারদিকে দেয়াল আর ঝোঁপ-জঙ্গল ভর্তি। স্থানটি অতি গোপনীয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ভাগ্যের ওপর বিশ্বাস ছিলো বনহুরের। যা তার অদৃষ্টে আছে হবেই। তার শেষ পরিণতি এখানে মৃত্যু, তা কেউ রোধ করতে পারবে না। বনহুর বুঝতে পারলে তাকে এই নির্জন গোপন স্থানে হত্যা করা হবে। হাত দুখানা তার পিছমোড়া করে বাঁধা। চোখেও কালো কাপড় বাধা ছিলো, এখন যদিও চোখ দুটো মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিলো কিন্তু হাত দুখানা তেমনি বাঁধা আছে মজবুত করে।

বনহুর নিশ্চুপ।

মতিলাল তার সঙ্গীদের কিছু ইংগিত করলো।

সঙ্গে সঙ্গে তারা বনহুরকে তুলে নিলো এবং পাশেই বৃহৎ আকার একটি কূপের পাশে এনে দাঁড় করলো।

এবার কিন্তু বনহুর শিউরে উঠলো।

কূপটার মধ্যে জমাট অন্ধকার। চারপাশে খাড়া পাড়, অবশ্য ভাঙাচুরা পাড় খাড়া হয়ে আছে। এ কূপটি অত্যন্ত ভয়াবহ তাতে কোনো ভুল নেই।

মতিলাল দাঁতে দাঁত পিষে বললো–এর নাম মৃত্যুকূপ। তোমাকে আমি হত্যা করে পৃথিবী থেকে নিষ্কৃতি দেবো না, আমি চাই তুমি তিল তিল করে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করো।

বনহুর তাকিয়ে ছিলো অন্যমনস্কভাবে, মতিলালের কথায় সে ভাল করে একবার মৃত্যুকূপটা দেখে নিলো, কোনো জবাব দিলো না।

মতিলাল বনহুরকে ঠেলে নিয়ে এলো মৃত্যুকূপের পাশে, একদম ধারে।

বনহুরকে ভাববার সময় না দিয়েই মতিলাল ঠেলে ফেলে দিলো কূপের মধ্যে।

মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলো বনহুর, কাজেই সে ভীষণভাবে ঘাবড়ে গেলো না। মৃত্যুকূপের তলদেশে পৌঁছেও নিশ্চুপ ছিলো বনহুর অবশ্য সে দুচোখ বন্ধ করে ফেলেছিলো। একটা কঠিন মৃত্যু যন্ত্রণার জন্য তৈরি ছিলো সে। কিন্তু তার দেহ একটি কোমল পদার্থ স্পর্শ করলো। তাড়াতাড়ি চোখ মেলে তাকালো বনহুর। একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন কক্ষ, তার মধ্যে পাকার গালিচা একপাশে ভাজ করে রাখা হয়েছে। বনহুরের দেহটা এসে পড়েছিলো সেই মখমলের গালিচার স্তূপের ওপর।

চোখ মেলে বিস্ময় নিয়ে দেখতে লাগলো বনহুর। হাত দুখানা তার এখনও বাধা। উঠে দাঁড়ালো, মৃত্যুকূপে এমন সুন্দর কক্ষ এবং এতো আলো। বনহুর ভাবতেও পারেনি এমন কিছু দেখবে সে। মৃত্যুকূপের উপরিভাগ এমন ভয়ংকর যা সত্যি মানুষের মনে হৃদকম্প সৃষ্টি করে। জমাট অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না, অবশ্য বনহুর নিক্ষিপ্ত হবার পর বেশ কিছুক্ষণ সময় লেগেছিলো তার দেহটা মৃত্তিকা স্পর্শ করতে।

বনহুর উঠে দাঁড়ানোর পর এগুতে লাগলো, সেই কক্ষের একপাশে স্তূপাকার গালিচা, একপাশে নানা ধরনের মণিমুক্তাখচিত আসন। একপাশে নানা বর্ণের আলোর ঝাড়, একপাশে মূল্যবান পানির পাত্র।

অবাক চোখে দেখছে বনহুর।

যদিও তার হাত দুখানা মজবুত করে বাঁধা তবু চোখ দুটো তার মুক্ত তাই সব দেখতে পাচ্ছিলো সে।

বনহুর আরও কিছুটা এগুতেই দেখলো একটা সুন্দর দরজা। এবার বনহুর সেই দরজায় মৃদু চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেলো। আরও অবাক হলো বনহুর, এ কক্ষে সারিবদ্ধ টেবিল, টেবিলে মূল্যবান নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য থরে থরে সাজানো। বনহুর বুঝতে পারলো এখানে এক্ষুণি কোনো ব্যক্তিদের আগমন হবে এবং তারা এসব খাদ্যদ্রব্য খাবে। যদি অযাচিতভাবে এখন এখানে এ অবস্থায় দেখে তাহলে নিশ্চয়ই তারা খুশি হবে না। বরং কোনো গোপন স্থানে আত্মগোপন করে সব লক্ষ্য করাই শ্রেয় হবে।

বনহুর যা ভাবলো ঠিক তাই হলো।

সে শুনতে পেলো নারীকণ্ঠের উচ্ছল হাস্যধ্বনি।

বনহুর তাড়াতাড়ি একটি দেয়ালের পাশে আত্মগোপন করে দেখতে লাগলো।

একদল সুন্দরী তরুণী ধবধবে ড্রেস পরিহিতা সেই কক্ষে প্রবেশ করলো। তাদের সকলের দেহের পোশাক সাদা কিন্তু হাতের বাজুতে একটি লাল রুমাল বাঁধা।

সবাই টেবিলগুলোর চারপাশে আসনে উপবেশন করে টেবিলে সাজানো খাবার খেতে লাগলো।

তাদের হাস্যধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো কক্ষটি।

বনহুর সব লক্ষ্য করছে।

যদি ওরা দেখে ফেলে তখন তার অবস্থা শোচনীয় হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ তার হাত দুখানা শৃংখলাবদ্ধ রয়েছে, নিশ্চয়ই ওরা তাকে ভাল নজরে দেখবে না। একটা সন্দেহ জাগবে তাদের মনে। কিন্তু এরা কারা, মৃত্যুকূপের মধ্যে এমনভাবে সুসজ্জিত কক্ষ, এমন আসবাবপত্র এলো কি করে?

কিন্তু কে দেবে এর জবাব?

ওরা কারা কেমন করেই বা মৃত্যুকূপের মধ্যে এলো।

এক সময় ওদের খাওয়া–দাওয়া সম্পন্ন হলো। সবাই যেভাবে এসেছিলো সেইভাবে বেরিয়ে গেলো।

বনহুর কতক্ষণ এভাবে আত্মগোপন করে থাকবে। সে অতি সাবধানে অগ্রসর হলো যে পথে তরুণীদল চলে গিয়েছিলো সেই পথে।

মাঝামাঝি আরও একটি কক্ষ, তারপর একটি দরজা। বনহুর অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে লাগলো। কিছুটা এগুতেই বনহুরের কানে এলো একটা সঙ্গীতের সুর। সুরটা বনহুরের অপরিচিত হলেও বড় মিষ্ট এবং আনন্দদায়ক। বনহুর তবু এগিয়ে চলল, ঐ সুর তাকে যেন আকর্ষণ করছে।

একটি বিস্ময়কর দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হলো তার। একটি সুউচ্চ আসনে উপবিষ্ট এক রাজকন্যা। অপূর্ব তার রূপলাবণ্য। রাশিকৃত কেশ ছড়িয়ে আছে পিঠে–কাঁধে। চোখ দুটি মায়াময়। সমস্ত দেহে শুভ্র বসন।

তার আসনের দুপাশে সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান সেই তরুণীদল যারা সাদা ধবধবে বসন পরিহিত অবস্থায় খাদ্য গ্রহণ করেছিলো একটু পূর্বে পাশের সেই মনোরম কক্ষে। বনহুরের চিনতে মোটেই দেরি হলো না এরাই সেই তরুণীদল।

বনহুর আত্মগোপন করে দেখছিলো, দুচোখে তার বিস্ময় কারণ মৃত্যুকূপের অভ্যন্তরে এমন রহস্য লুকিয়ে আছে তা কেউ জানে না। বনহুরকে ওরা হত্যার জন্য মৃত্যুকূপে নিক্ষেপ করেছিলো। যাতে সে ভীষণ কষ্ট পেয়ে মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু কেউ জানতো না মৃত্যুকূপের তলদেশে এখনও মতিমহল সুরক্ষিত রয়েছে।

ওরা সঙ্গীত দিয়ে রাজকন্যাটিকে অভিনন্দন জানালো। তারপর অভিনব কায়দায় অভিবাদন জানালো তরুণীদল রাজকন্যাকে। অবশ্য সিংহাসন না হলেও আসনটি ছিলো সুসজ্জিত এবং সেই আসনে উপবিষ্টা ছিলো শুভ্রবসনা তরুণীটি।

বনহুর অবাক হয়ে ওদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিলো।

হঠাৎ শুভ্রবসনা বলে উঠলো–আমার আবাসস্থলে কোনো ব্যক্তির আগমন ঘটেছে। কারণ আমি ঐ রকম সংকেত পাচ্ছি।

বনহুর চকিত হয়ে উঠলো।

সে বুঝতে পারলো তার আত্মগোপনতা ব্যর্থ হয়েছে। শুভ্রবসনার সম্মুখে দেয়ালে মূল্যবান কাঁচ বসানো রয়েছে যার মধ্যে কক্ষের সবকিছু নজরে পড়ছে তার।

শুভ্রবসনা উঠে দাঁড়িয়ে ইংগিত করলো–ঐদিকে কে আছে তাকে বেরিয়ে আসতে বলে।

এবার বনহুর আপন ইচ্ছায় আড়াল হতে বেরিয়ে এলো, কারণ সে বুঝতে পারলো আর লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়।

বনহুরকে দেখে অবাক হলো সবাই।

তরুণীদল এ ওকে ফিসফিস করে কিছু বলছিলো।

সবার চোখেমুখেই ভীত আতঙ্কিত ভাব ফুটে উঠেছে। শুভ্রবসনার দুচোখেও বিস্ময়, বললো শুভ্রবসনা–কে তুমি! এখানে কিভাবে এলে?

বনহুর বললো–ঝামরাণীর দেহরক্ষীদল আমাকে কঠিন শাস্তি দেবার জন্য মৃত্যুকূপে নিক্ষেপ করেছিলো…

হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠলো শুভ্রবসনা।

শুভ্রবসনা বললো–আমি তোমার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, কারণ তোমার হাত দুখানাই তার প্রমাণ দিচ্ছে তুমি মিথ্যা কথা বলছে না।

বললো বনহুর–আমার অভিনন্দন গ্রহণ করো। এতো সহজে আমার কথা তুমি বিশ্বাস করবে তা ভাবতে পারিনি।

কে তুমি? কি তোমার পরিচয়? বললো শুভ্রবসনা।

চারপাশে তরুণীদল বিস্ময় নিয়ে দেখছে। তাদের দলনেত্রী আগন্তুকের সঙ্গে যেভাবে কথা বলছে তাতে তাদের মুখোভাবও প্রসন্ন হয়।

তারা মনে করেছিলো কোনো দুষ্ট লোক তাদের এই নির্জনতার শান্তি ভঙ্গ করতে এসেছে। সবগুলো মহিলা অবাক এবং ভীত হয়ে পড়েছিলো, এবার তারা মনোযোগী হয়ে সব শুনতে লাগলো।

বনহুর বললো–আমার পরিচয়–আমি একজন মানুষ।

তাতে দেখতেই পাচ্ছি। কি নাম এবং কোন দেশ থেকে তুমি এসেছো?

নাম বনহুর, কান্দাই হতে এসেছি।

ঝামরাণীর দেহরক্ষীদের কবলে পড়লে কি করে?

সে অনেক কথা। সব বলব, আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি আমার কথা তোমরা অতি সহজে অনুধাবনে সক্ষম হয়েছে বলে। বললো বনহুর। তারপর বললো–তুমি কে, তোমার পরিচয় আমি জানতে ইচ্ছুক।

দলনেত্রী হেসে বললো–যে পোড়োবাড়ির অভ্যন্তরে এই মৃত্যুকূপ অবস্থিত সেই বাড়ি ব প্রাসাদের অধিকারিণী আমি। আমার সব কথা তোমার জানা দরকার মনে করি না, কারণ তুমি এখন আমাদের বন্দী। এ স্থান হতে তোমার পালাবার কোনো উপায় নেই।

তাহলে কি আমার হাত দুখানা এভাবেই থাকবে?

না।

সত্যি মুক্ত হবে আমার হাত দু খানা?

হবে।

কখন, কি উপায়ে?

বিচার শেষে।

বিচার।

হাঁ।

কোথায় আমার বিচার হবে?

আমার পিতার দরবারে।

তোমার পিতা।

হা।

তিনি কে জানতে পারি কি?

পারো।

বলো তবে? কে তিনি এবং কোথায় আছেন?

ভূগর্ভে তিনি আছেন।

দলনেত্রীর কথা শুনে বনহুর বেশ অবাক হলো। বললো বনহুর–তিনি কি তাহলে এই রাজপ্রাসাদের……

হাঁ, তিনিই এই ভগ্ন রাজপ্রাসাদের মালিক–রাজা বলতে পারো। একটু থেমে বললো দলনেত্রী–অনেক কথা তোমার সঙ্গে বললাম যা আমার উচিত হয়নি। আমার সহচরীগণ বিস্ময় প্রকাশ করছে। আমি তাদের মুখোভাব লক্ষ্য করেই বুঝতে পারছি।

বনহুর একবার তাকিয়ে দেখে নিলো দলনেত্রীর সঙ্গীদের চেহারা। দলনেত্রী শুভ্রবসনা বললো–এসো আমার সঙ্গে।

সঙ্গিনীগণ অভিবাদন জানালো দলনেত্রীকে।

বনহুরকে সঙ্গে করে চলে গেলো দলনেত্রী অপর এক দরজা দিয়ে আরও ভেতরের দিকে।

বনহুর অবাক, কারণ পরপর বেশ কয়েকটা দরজা পার হলো দলনেত্রী। যখন সে বনহুরকে সঙ্গে করে দরজাগুলোর সম্মুখে এসে দাঁড়ায় তখন দরজা আপনা আপনি খুলে যাচ্ছিলো। শুভ্রবসনা দলনেত্রী সেই দরজা দিয়ে বনহুরসহ ভেতরে প্রবেশ করছিলো।

ভূগর্ভে এমন দক্ষতার সঙ্গে একটি বিরাট রাজপ্রাসাদ গড়ে তোলা হয়েছে দেখে সত্যি বিস্ময় জাগে তার মনে। এরপর এমন এক কক্ষে প্রবেশ করলো শুভ্রবসনা যে কক্ষটি বিশেষ কোনো রাজদরবার।

শুভ্রবসনা সেখানে প্রবেশ করতেই পথ মুক্ত করে দিলো প্রহরীরা।

বনহুর দেখতে পেলো সম্মুখে একটি রাজসিংহাসন। মনিমুক্তা এবং মূল্যবান পাথরে তৈরি সেই রাজসিংহাসনটি। দু পাশে সারিবদ্ধ আরও কয়েকটি আসন। সেই আসনগুলোর পাশে এক একটি প্রহরী দন্ডায়মান।

বনহুর অবাক চোখে দেখছে সিংহাসনে উপবিষ্ট এক বৃদ্ধ। কেশ এবং দাড়ি–গোঁফ সব সাদা ধবধবে। কমপক্ষে বয়স তার এক শ বছরের বেশি হবে।

শুভ্রবসনা তাকে অভিবাদন জানালো।

বৃদ্ধ বললো–বৎস, বলো কি কারণে আগমন? আর এই আগন্তুকটিই বা কে?

প্রহরীরা নিজ নিজ অস্ত্র বাগিয়ে ধরে দন্ডায়মান।

পার্শ্বস্থ আসনে যে সব ব্যক্তি উপবিষ্ট, তারাও বৃদ্ধ। সত্তর বছরের কম কারও বয়স নয়। প্রহরিগণের বয়সও প্রায় পারিষদগণের কাছাকাছি।

শুভ্রবসনা বললো–পিতা, আমার সঙ্গীটি মৃত্যুদন্ডিত। তাকে ঝামরাণীর দেহরক্ষীগণ মৃত্যুকূপে নিক্ষেপ করেছে।

এ কথা শুনে বৃদ্ধ মহারাজ অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলেন। বললেন তিনি–বৎস, ওর পরিচয় জেনে নিয়েছো?

হাঁ পিতা। বললো শুভ্রবসনা। একটু থেমে বললো সে–পিতা, ওর হাত দুখানা মুক্ত করে দেবার অনুমতি দাও?

যাও মুক্ত করে দাও কিন্তু ওকে সাবধানে রেখো, যেন আবার কোনো বিপদে না পড়ে।

মহারাজের কথা শুনে আশ্বস্ত হলো বনহুর।

সত্য হৃদয়বান রাজা বটে।

বৃদ্ধ হলেও তার তেজদীপ্ত কণ্ঠস্বর এবং মহৎ ব্যবহার বনহুরকে আকৃষ্ট করলো। নত মস্তকে বনহুর অভিবাদন জানালে মহারাজকে। ভাবতেও পারেনি বনহুর তার ভাগ্য এমন প্রসন্ন হবে। শুভ্রবসনা যখন তাকে সঙ্গে করে রাজদরবারে নিয়ে আসছিলো তখন বনহুর ভেবেছিলো হয়তো বা–আবার একটা নতুন বিপদের সম্মুখীন সে হতে যাচ্ছে। রাজদরবার শুধু নয়, মৃত্যুকূপে নিক্ষিপ্ত হবার পর হতেই বনহুরের মনে দারুণ বিস্ময় সৃষ্টি হয়েছিলো। ভেবেছিলো সে, ভয়ংকর অন্ধকারময় হাজার বছরের পুরানো কুপের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন একটা অবস্থা বিরাজ করছে। যেখানে নিক্ষিপ্ত হলে তার মৃত্যু সুনিশ্চিত। কিন্তু সে নিক্ষিপ্ত হবার পর অদ্ভুত পরিবেশ তাকে নতুন এক পথে নিয়ে এসেছে যা সে কল্পনাও করেনি। মৃত্যুকূপের অভ্যন্তরে রাজপ্রাসাদ, শুধু রাজপ্রাসাদই নয়, রাজদরবার–এক সুন্দর সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য পরিচালনা হচ্ছে।

বনহুর শুধু মুগ্ধই নয়, হতভম্ব হয়ে পড়েছে।

রাজকন্যা শুভ্রবসনা বললো–এসো আমার সঙ্গে।

বনহুর আর একবার মহারাজের দিকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো, তারপর শুভ্রবসনার সঙ্গে রাজদরবার ত্যাগ করলো।

রাজ দরবার ত্যাগ করে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে দুজন অনুচর তাদের সামনে দন্ডায়মান হলো।

শুভ্রবসনা রাজপ্রহরীদ্বয়কে লক্ষ্য করে বললো–যাও এর হাত দুখানা মুক্ত করে নিয়ে এসো।

প্রহরীদ্বয় বনহুরকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলো। এমন একটি কক্ষে নিয়ে গেলো যেখানে নানা ধরনের যন্ত্রাদি থরে থরে সাজানো রয়েছে। দুজন লোক বসে আছে সেখানে। তাদের চেহারা এবং পোশাক দেখে মনে হলো তারা ঐ যন্ত্রাদি ব্যবহারের কাজে নিয়োজিত আছে।

ওরা বনহুরের হস্তদ্বয় মুক্ত করে দিলো।

এবার বনহুর বেশ স্বস্তি বোধ করছে। ফিরে এলো সে শুভ্রবসনার পাশে। যে দুজন প্রহরী তাকে সঙ্গী করে নিয়ে গিয়েছিলো তারা শুভ্রবসনাকে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করলো।

শুভ্রবসনা বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো–এসো।

বনহুর শুভ্রবসনাকে অনুসরণ করলো।

একটি সুসজ্জিত কক্ষ।

মুখোমুখি দুটো আসন। মাঝখানে একটি টেবিল। শুভ্রবসনা বনহুরকে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বললো–বসো।

বনহুর বসলো।

মাঝে মাঝে সে হাতের ওপরে হাত বুলিয়ে বন্ধনমুক্ত হাত দু খানার ব্যথা লাঘব করার চেষ্টা করছিলো। সবচেয়ে বড় বিস্ময় বনহুরের মনে–এরা তাকে নতুন মানুষ জেনেও কোনো সন্দেহের নজরে দেখছে না। বিশ্বাস এদের অপরিসীম, মহৎ এদের ব্যবহার।

শুভ্রবসনা বললো–ভাবনার কোনো কারণ নেই। এক্ষুণি খাবার এসে যাবে।

অবশ্য বনহুরের ক্ষুধা পেয়েছিলো তবে ঐ মুহূর্তে সে ক্ষুধার কথা ভাবছিলো না। ভাবছিলো মৃত্যুকূপে নিক্ষিপ্ত হবার পর ঘটনাগুলোর কথা। এত সহজে তার হাত দুখানা মুক্ত হবে এটা যেন বিস্ময়কর ব্যাপার।

শুভ্রবসনা করতালি দিলো।

সংগে সংগে একটি তরুণী কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে হাজির হলো।

শুভ্রবসনা ইংগিত করলো খাবারগুলো টেবিলে রাখতে।

তরুণী শুভ্রবসনার নির্দেশমত কাজ করলো।

একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলো সে।

বনহুরকে কিছু বলবার পূর্বেই বললো শুভ্রবসনা–নিভা, তুই চলে যা।

তরুণীর নাম নিভা। সে শুভ্রবসনার কথা শোনামাত্র চলে গেলো সেখান হতে।

শুভ্রবসনা বনহুকে বললো–জানি তুমি ক্ষুধার্ত, খাও।

বনহুর কোনো আপত্তি না করে খাবার খেতে শুরু করলো।

শুভ্রবসনা বললো–তুমি বিপদগ্রস্ত অতিথি। তোমার সেবা আমাদের একান্ত দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য। যত খুশি তুমি খাও।

বনহুর খেতে খেতে বললো–আমার জন্য তোমরা যা করছে তা সত্যি প্রশংসনীয়। কৃতজ্ঞ আমি তোমাদের কাছে। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি ভীষণ অবাক হচ্ছি তা হলো, তোমরা মৃত্যুকূপের অভ্যন্তরে এমনভাবে রাজকার্য চালনা না করে পৃথিবীর বুকে প্রকাশ্যে এ রাজপ্রাসাদ গড়ে তুলতে পারতে এবং রাজকার্য পরিচালনা করতে সক্ষম হতেন মহারাজ।

বনহুরের কথায় একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললো শুভ্রবসনা–সে অনেক কথা। যদি তুমি জানতে চাও তবে আমি আমার পিতাকে বলবো সব, তোমাকে বলবেন তিনি।

বেশ, তাই হবে। শুভ্রবসনা, তোমার পরিচয় জানতে পারলাম তুমি রাজদুহিতা।

হাঁ

তোমার নাম?

শ্বেতা

অদ্ভুত তোমার নাম তো?

কেন, শ্বেতা নামটা ভাল লাগলো না?

চমৎকার। বড় সুন্দর নাম শ্বেতাঙ্গিনী...

হাসলো শুভ্রবসনা, সে এবার আসনে হেলান দিয়ে বসে বললো–তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে। আমার সঙ্গীদের চেয়েও।

বনহুর স্থিরদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে শ্বেতার মুখের দিকে। মেয়েটি আশ্চর্য বটে। চোখ দুটি ডাগর, তাতে মায়াভরা চাহনি। সোনালী চুলগুলো ছড়িয়ে আছে কাঁধে–পিঠে–কপালে। সমস্ত দেহ শুভ্রবসনে আবৃত। হাতের আংগুলে মূল্যবান পাথরের আংটি। আংটির পাথর থেকে বিচ্ছুরিত আলো ছড়িয়ে পড়ছে তারার আলোর মত। শ্বেত সুন্দরী বটে, দেহলাবণ্য তার অপূর্ব বলা যায়।

বনহুর এতক্ষণ এমন করে তাকে লক্ষ্য করবার সময় পায়নি। শ্বেতার দেহ কোনোদিন সূর্যের কিরণ স্পর্শ করেনি বলেই মনে হয়। কারণ মৃত্যুকূপের গহ্বরে সূর্যের দেহ কোনোদিন সূর্যের তাপ স্পর্শ করতে সক্ষম হয় নি।

শ্বেতা বললো–আমার দিকে তাকিয়ে কি ভাবছো?

বনহুর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বললো–কিছু না।

চলো, তোমাকে বাবার কাছে নিয়ে যাই। বাবাও তোমাকে পছন্দ করেছেন এবং সে কারণেই তিনি তোমার হস্তদ্বয় মুক্ত করে দিতে আদেশ দিয়েছিলেন।

বেশ তো চলো। বনহুর উঠে দাঁড়ালো।

শ্বেতাও আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললো–চলো।

অপর এক দরজা দিয়ে শ্বেতা বনহুরকে নিয়ে অগ্রসর হলো। এপথ আরও বিস্ময়কর, বনহুর দুচোখ মেলে দেখছে, গভীর মাটির তলায় একটি রাজ্য।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর একটি কক্ষ।

কক্ষের দরজায় দুজন অস্ত্রধারী প্রহরী দন্ডায়মান।

শ্বেতা বনহুর সহ যখন দরজার পাশে এসে দাঁড়ালো তখন অস্ত্রধারী প্রহরীদ্বয় নত হয়ে অভিবাদন জানালো এবং সরে দাঁড়ালো দুজন দুপাশে।

শ্বেতা দরজায় পা রেখে বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো–এসো।

ভেতরে প্রবেশ করার পর আরও কয়েকটা দরজা পেরুতে হলো প্রতিটি দরজার পাশে অস্ত্রধারী প্রহরী দন্ডায়মান। সকলেই শেতাকে দেখামাত্র অভিবাদন করে সরে দাঁড়াচ্ছিলো।

এবার যে কক্ষে প্রবেশ করলো শ্বেতা এবং বনহুর সেই কক্ষ অন্যান্য কক্ষের চেয়ে আলাদা। বিরাট কক্ষের মধ্যে স্বর্ণের তৈরি একটি খাট এবং খাটের ওপর দুগ্ধ ফেননিভ শয্যা।

শয্যায় শায়িত বৃদ্ধ মহারাজ।

শুভ্র দাড়ি-গোঁফ এবং ভ্রু জোড়াও শুভ্র হয়ে পড়েছে।

রাজতনয়া শ্বেতার সঙ্গে সেই অপরিচিত ব্যক্তিটিকে দেখে রাজা শয্যায় উঠে বসলেন। বালিশে হেলান দিয়ে অর্ধশয়িত অবস্থায় বললেন মহারাজ–শ্বেতা মা, হঠাৎ কেন আগমন তোমার? আগন্তুকটিকেও তোমার সঙ্গে দেখছি, ব্যাপার কি?

বললো শ্বেতা–পিতা এর পরিচয় তুমি জানো না এবং সব ঘটনাও তুমি জানো না। এর ইচ্ছা তুমি তার সবকিছু জানো এবং তোমার সবকিছু তাকে বলো।

এই কথা। বৎস, আমি বুঝতে পেরেছি ঝামরাণীর দেহরক্ষীদের মধ্যে সবচেয়ে দুষ্ট দেহরক্ষী ভীমসেন, সেই তোমাকে মৃত্যুকূপে নিক্ষেপ করেছে। শুধু তোমাকে নয়, নির্বোধ আরও শত শত ব্যক্তিকে সামান্য অপরাধে মৃত্যুকূপে নিক্ষেপ করে নিশ্চিন্ত হয়েছে। সে জানে যাদের সে মৃত্যুকূপে নিক্ষেপ করেছে তারা সবাই মৃত্যুবরণ করেছে। কিন্তু এদের কেউ মৃত্যুবরণ করেনি, সবাইকে আমি আমার ভূগর্তরাজ্যে স্থান দিয়েছি। জানি তুমিও তেমনি একজন। একটু থেমে পুনরায় বলতে শুরু করলেন মহারাজ–যারা এই মৃত্যুকূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তারা আজ আমার স্নেহের পাত্র। আমি তাদের আশ্রয়ই শুধু দেইনি, তাদের সকলকে এক একটি কাজের দায়িত্বভার দিয়েছি। ধন–রত্ন টাকাকড়ির কোনো অভাব নেই আমার রাজ্যে। রাজভান্ডার সর্বক্ষণ উন্মুক্ত রয়েছে, যার যা খুশি ইচ্ছামত গ্রহণ করতে পারে। খাদ্যভান্ডারে খাদ্যের কোনো অভাব নেই, যার যা খুশি খেতে পারে। অবকাশ মুহূর্ত কাটাবার জন্য নৃত্যশালা আছে, আছে গানবাজনা–যা শুনতে–দেখতে ইচ্ছা সবকিছু আছে আমার রাজ্যে।

বনহুর বিস্ময় নিয়ে শুনে যাচ্ছিলো, এবার বললো–সত্যি বড় সুন্দর আপনার রাজ্য।

তুমি শুনে খুশি হয়েছে দেখছি।

হাঁ, আমার বড় আনন্দ হচ্ছে।

তাহলে মৃত্যুকূপ তোমার জীবনে নতুন ধারা বহন করে এনেছে।

সত্যি তাই।

বসো বৎস। শ্বেতা, তুমিও বসো।

শ্বেতা নিজে আসন গ্রহণ করলো এবং বনহুরকে আসন গ্রহণ করার জন্য ইংগিত করলো।

বনহুর একটি আসনে বসলো।

মহারাজ বলে চলেছেন–দ্বীপঙ্কর রায় ছিলেন আঁসির মহারাজ। আমি সেই বীরবর দ্বীপঙ্করের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান কিংকর রায়। মহারাজ দ্বীপঙ্কর রায় নিহত হলেন এবং তার ছয় সন্তান নিহত হলো ঝাসির সেনাপতির হাতে। যুদ্ধে নয় চক্রান্তের বেড়াজালে জড়িয়ে পড়ে আমার পিতা মৃত্যুবরণ করলেন, তারপর কৌশলে আমার ছয় ভাইকে হত্যা করা হলো। পিতার বিশ্বস্ত মন্ত্রীবর জয়রাজ দেখলেন ঝাঁসির রাজবংশ নিঃশেষ হতে চলেছে, এ পৃথিবী থেকে মুছে যাচ্ছে ঝাসির রাজবংশ, তখন একদিন গভীর রাতে জয়রাজ আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। আমার দুচোখ নিদ্রায় ঢুলু ঢুলু, আমি পথ চলতে পারছিলাম না, তখন জয়রাজ আমাকে কাঁধে তুলে নিলেন। তারপর যখন আমার ঘুম ভাঙলো তখন দেখলাম একটি অন্ধকার স্থানে আমি ঘুমিয়ে আছি। পাশে কেউ নেই। আমি ভীত হয়ে চারদিকে তাকালাম, হঠাৎ একটা শব্দ হলো। দেখলাম পাশে এসে দাঁড়ালেন জয়রাজ। হাতে তার একটি পুঁটলি। আমার সম্মুখে রেখে বললেন তিনি–বৎস, কোনো চিন্তা করো না, এসব খেয়ে নাও।

আমি অবাক হয়ে তাকালাম তার দিকে।

জয়রাজ আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন–এটা মৃত্যুকূপ। এখানে কেউ কোনোদিন আসবে না, কেউ জানবে না তুমি এখানে আছো।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। আবছা অন্ধকারে জয়রাজকে দেখছি। বললাম–মৃত্যুকূপে আমি থাকবো না।

তিনি আমার কথা শুনে হাসলেন, সে হাসি ছিলো ব্যথাকরুণ, ম্লান। বললেন জয়রাজ–বৎস, তুমি এখনও অবুঝ, তুমি যদি জানতে সব বুঝতে তাহলে এ মৃত্যুকূপ তোমার জন্য শ্রেষ্ঠ এবং নিরাপদ স্থান বলে মনে করতে। খাও বৎস, পরে তোমাকে সব বলবো।

আমি তার কথা শুনলাম, কোনো প্রতিবাদ না করে খাবারগুলো খেলাম। তারপর এমনি করে কেটে চললো আমার দিনগুলো অন্ধকারময় এক গহ্বরে। বাইরের আবহাওয়া থেকে বঞ্চিত হলাম। মাঝে মাঝে খুব কাঁদতাম, কারণ– রাজকুমার আমি, জন্মাবার পর হতে রাজপ্রাসাদের আদরযত্নে লালিত পালিত, আর আজ আমার অবস্থা এমন করুণ। তবুও কোনো উপায় ছিলো না।

একদিন আমি খুব কাঁদছি।

জয়রাজ আমাকে কিছুতেই প্রবোধ দিতে পারছিলেন না। যতই তিনি সান্তনা দেবার চেষ্টা করছেন ততই আমি আরও অবুঝ হয়ে কাঁদছিলাম। অবশ্য কারণ ছিলো, একে অন্ধকারময় মৃত্যুগহবর, তারপর জয়রাজ সমস্ত দিন আমার পাশে থাকতেন না। আমি জয়রাজকে রাজপ্রাসাদে থাকাকালীন কোনো দিন আমার সঙ্গে ভাল ভাবে কথা বলতে দেখিনি বা তার কাছে আদরযত্ন পাইনি, এ কারণেও তাকে আমার খুব একটা ভাল লাগতো না। তবুও এই নির্জন গহ্বরে নিঃসঙ্গ অবস্থায় তাঁকে বড় আপনজন মনে হতো। কিন্তু তিনি কোথায় যেতেন জানতাম না। সারাক্ষণ তিনি নিখোঁজ থাকতেন। হঠাৎ এক সময় এসে হাজির হতেন। আমি তাকে সর্বক্ষণ অত্যন্ত ব্যস্ত দেখতাম। যেদিন আমি খুব কাঁদছিলাম, সেদিন যখন তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিতে ব্যর্থ হলেন তখন ভীষণ জোরে একটা চড় মারলেন আমার কণ্ঠ দেশে। আমার কান্না থেমে গেলো, খুব ভীত হলাম আমি। এভাবে আমার কান্না মোটেই সমীচীন হয়নি বুঝতে পারলাম। আমার কোমল মনে একরাশ প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো।

জয়রাজ হয়তো আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন, তিনি আমাকে বুকে টেনে নিয়ে মাথায় পিঠে হাত বুলালেন। প্রথমে তিনি কথাই বলতে পারলেন না, কারণ আমার শরীরে আঘাত করে তিনি অত্যন্ত ব্যথা পেয়েছিলেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকার পর জয়রাজ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন–কিংকর, তুই বুঝবি না কেন তোকে এখানে লুকিয়ে রেখেছি। সেনাপতি রাঘবলাল তোর পিতা মহারাজ দীপঙ্কর রায়কে হত্যা করেছে। তোর ছয় সহোদর হিমাঙ্কর রায়, রথীন রায়, শংকর রায়, জ্যোতি রায়, বিজয় রায়, সূর্য রায়কে হত্যা করেছে। পূর্বে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছে তোর জননী কিংকরী বাঈকে। তোর নাম তোর মা নিজের নামের সঙ্গে যোগ করে রেখেছিলো কিংকর রায়। তোর বয়স যখন পাঁচ বছর তোর মাকে ঐ নরপশু এক পরিচারিকার দ্বারা বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। তোর মায়ের মৃত্যু মহারাজ দ্বীপঙ্কর রায়কে মুষড়ে ফেলে। রাজকার্যে আর তার মন তেমন বসতো না। আমার ওপর ছিলো মহারাজের অটুট বিশ্বাস তাই তিনি সব সময় আমাকে রাজকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্তভাবে স্বর্গবাসিনী স্ত্রীর কথা ভাবতেন।

জয়রাজ বলে চলেছেন।

আমি মনোযোগ সহকারে শুনছি। বয়স আমার তখন বারো অথবা তেরো হবে। বেশ বুঝতে শিখেছি। রাজপ্রাসাদে থাকলেও এতকিছু জানতাম না। আজ এসব শুনে অবাক যেমন হচ্ছি তেমনি হচ্ছি ব্যাথাকাতর। প্রাসাদে জয়রাজকে কোনোদিন আমাদের সঙ্গে ভালভাবে কথা বলতে দেখিনি, আদর করা তো দূরের কথা। তবে লক্ষ্য করতাম মাঝে মাঝে দূর থেকে জয়রাজ আমার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে আছেন। পিতার মৃত্যুর পর একটু মেহের আশায় জয়রাজের কাছে গিয়েছি, তিনি তাড়িয়ে দিয়েছেন নির্মমভাবে। সেই জয়রাজ আজ এভাবে আমার সঙ্গে কথা বলছেন, আশ্চর্য বটে। আজ জয়রাজকে কেন যেন বড় আপনজন মনে হচ্ছিলো। বলছেন জয়রাজ–আমি রাজকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেও সেনাপতি রাঘব লালই রাজকার্য চালিয়ে যেতে লাগলো গোপনে। আমাকে জানিয়ে দিলো এ ব্যাপারে যদি তাকে সাহায্য না করি, তাহলে আমাকে হত্যা করা হবে, কাজেই আমি নিশ্চুপ রইলাম। মহারাজের যেন কোনো ক্ষতিসাধন না করতে পারে এ ব্যাপারে সজাগ হলাম। মহারাজকে সাবধানও করে দিলাম গোপনে কিন্তু ফল হলো না। আমার কথা মহারাজ দ্বীপঙ্কর রায় কানেই নিলেন না। যেমন উদাসীন তিনি রাজকার্যে তেমনি উদাসীন তিনি নিজের জীবনের প্রতি। আমি পারলাম না মহারাজকে বাঁচাতে, তিনি নিহত হলেন।

রাজপরিবার শোকে মুহ্যমান হলো কিন্তু নরাধম সেনাপতির বিরুদ্ধে টু শব্দ করতে পারলো না।

সমস্ত সৈন্যদলকে সেনাপতি রাঘবলাল হাতের মুঠায় ভরে নিয়েছিলেন। আমি রাজার মৃত্যুশোকে কাতর হলেও মুখোভাবে তা প্রকাশ করলাম না বরং একটা যুক্তি আমাকে সজাগ করে তুললো–যদি বাঁচতে চাও এবং রাজবংশ রক্ষা করতে চাও তবে চালাকির সঙ্গে বাঁচতে হবে। ওর সঙ্গে মনেপ্রাণে যোগ না দিলেও অভিনয় করে যাও, তুমিও তারই লোক বনে যাও?

আমি তাই করলাম।

সেনাপতি রাঘবলালের কাজে সমর্থন জানালাম। যদিও আমার মঙ্গলাকাভিক্ষগণ বিস্মিত হলো তবু আমি ঘাবড়ালাম না। একমাত্র রাজবংশ রক্ষার্থে আমি অন্যমূর্তি ধারণ করলাম। কিংকর রাজবংশের শেষ প্রদীপ শিখা। এই প্রদীপ শিখা যাতে নিভে না যায় সে কারণে আমি শিশু কিংকরের সঙ্গে দুর্ব্যবহার শুরু করলাম। যেন রাঘবলাল বুঝতে পারে মন্ত্রী জয়রাজ ঠিক আছে।

সেনাপতির সঙ্গে এমনভাবে মিশতে লাগলাম যেন সে আমাকে তার হিতাকাক্ষী মনে করে। আমার এই আচরণে অনেকেই হতবাক হয়েছিলো। সেদিন আমি সেনাপতি রাঘবলালকে এমন এক আসনে প্রতিষ্ঠা করলাম যেন সেই মন্ত্রীবর, আমি তার আজ্ঞাবহ। উদ্দেশ্য কার্যসিদ্ধ করা।

হাঁ, আমি জয়ী হলাম, সেই নরশয়তান সেনাপতি রাঘবলালের চোখে ধূলো দিয়ে একদিন গভীর রাতে তাকে রাজপ্রাসাদ থেকে সরিয়ে ফেললাম। এবং তাকে জানালাম তোকেও আমি হত্যা করেছি। জানিস, আমাকে সেদিন দক্ষ অভিনেতার মত অভিনয় করতে হয়েছিলো। হাঃ হাঃ করে হেসে বলেছিলাম মহারাজ দীপঙ্করের শেষ স্মৃতিটুকুও নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি, আর কোনোদিন কেউ আসবে না রাঘবলাল তোমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে।

মহারাজ কিংকর রায় থামলেন, তার ঘোলাটে চোখ দুটো হঠাৎ তেজোদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। তিনি বলতে শুরু করলেন–মন্ত্রী জয়রাজ আমাকে সরিয়ে আনলেন রাজপ্রাসাদ থেকে কিন্তু তিনি নিশ্চুপ রইলেন না। মৃত্যুকূপের গহ্বরে গড়ে তুলতে লাগলেন এক নতুন রাজ্য। সেনাপতি রাঘবলালের বন্ধু ও হিতাকাক্ষী সেজে তিনি নতুন একটি অভিযান চালালেন। সকলের অজ্ঞাতে তিনি মহারাজু দীপঙ্করের

রাজভান্ডার থেকে ধনরত্ন সরিয়ে ফেলতে লাগলেন। তাঁকে সহায়তা করতে লাগলো রাজভান্ডারের রক্ষক। জয়রাজ মৃত্যুকূপের তলদেশে একটি মনোরম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন। সেনাপতি রাঘবলাল একটুও টের পেলো না। ধীরে ধীরে বেড়ে উঠতে লাগলাম আমি জয়রাজের নতুন রাজপ্রাসাদে, যে রাজপ্রাসাদে কোনো দিন সূর্যকিরণ প্রবেশে সক্ষম হলো না। জয়রাজকে আমি পিতার চেয়ে বেশি ভালবাসতাম, শ্রদ্ধাও করতাম। তিনিও আমাকে নিজ সন্তানের অধিক মনে করতেন। আমি যখন যৌবনে পদার্পণ করলাম তখন জয়রাজ অত্যন্ত বৃদ্ধ। অত্যন্ত পরিশ্রমে তার শরীর ক্রমান্বয়ে খারাপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। জয়রাজ কয়েকজনকে বিশ্বাস করতেন–রাজভান্ডার রক্ষককে এবং তার নিজ সন্তানদের। জয়রাজ তার একমাত্র কন্যাকে আমার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। ততদিনে ভূগর্ভস্থ রাজপ্রাসাদের কাজ সমাধা হয়েছে। সেনাপতি রাঘবলাল যাদের মৃত্যুদন্ড দিতো তাদেরকে মৃত্যুকূপে নিক্ষেপ করা হতো। মৃত্যুকুপের গহ্বরে ছিলো গভীর এক জলাশয়, যাকে মৃত্যুকূপে নিক্ষেপ করা হতো সে আর কোনো মতেই জীবনে রক্ষা পেতো না, মৃত্যু ছিলো তার নিশ্চিত। জয়রাজ মৃত্যুকূপের সেই গভীর জলাশয় বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে জলাশয়ের মুখ ফিরিয়ে অন্য পথে প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন।

বনহুর এতক্ষণ আশ্চর্য হয়ে শুনে যাচ্ছিলো মহারাজ কিংকর রায়ের বিস্ময়কর কাহিনী। এবার বললো বনহুর–মহারাজ, তাহলে এই রাজ প্রাসাদে প্রবেশের এবং বহিষ্কারের পথ....

হাঁ আছে কিন্তু সে পথমুখ অত্যন্ত ভয়ংকর স্থানে অবস্থিত, কারণ সেনাপতি রাঘবলালের দৃষ্টি এড়িয়ে সেই পথে এ রাজপ্রাসাদ গড়ে উঠেছে। জয়রাজ বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের এনে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। আমাকে জয়রাজ তার একমাত্র কন্যা জয়াকে দিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে নিলেন। হাঁ, জয়ার মত স্ত্রী পেয়ে আমি ধন্য হলাম। তারপর আমি ধীরে ধীরে ভুলে গেলাম একদিন পৃথিবীর আসল রূপ। জয়া আমার জীবনকে হাসিগানে ভরিয়ে তুললো। গর্ভে এলো সন্তান, কিন্তু কেউ জীবন নিয়ে জন্মালো না। হয়তো বা অন্ধকারময় জগতে তারা আলোর সন্ধান পাবে না বলেই জন্মাবার পূর্বেই বিদায় গ্রহণ করতো। জয়ার শেষ উপহার শ্বেতা। মহারাজ কিংকর রায় তাকালেন শ্বেতার দিকে, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন–জয়া শ্বেতার জন্ম দিয়ে চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলো, আর সে চোখ মেলে শ্বেতাকে দেখেনি বা দেখবার সুযোগ পায়নি।

বনহুর বললো–মন্ত্রী জয়রাজ...তিনি....

হ্যাঁ, তিনি ভূগর্ভস্থ রাজপ্রাসাদ গড়ে দেবার পর একদিন সেনাপতি রাঘবলালের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে তাকে হত্যা করেন কিন্তু তিনি আর স্বাভাবিক ছিলেন না, নিজেও আত্মহত্যা করেন রাঘবলালের সঙ্গী–সাথীদের হাতে বন্দী হবার পূর্বেই। তারপর মহারাজ দীপঙ্কর রায়ের রাজ্য শ্মশানে পরিণত হয়, এখন সেটা অভিশপ্তপুরী। এই হলো মৃত্যুকূপের মূল কাহিনী।

বনহুর বললো–এখন সেই মৃত্যুকূপ মৃত্যুদন্ডের একমাত্র পথ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বললেন মহারাজ কিংকর রায়–শুধু নরপশু এবং দুস্কৃতিকারিগণ ছাড়া এই মৃত্যুকূপের সন্ধান কেউ জানে না। ওরা নরাধম, যারা তোমার মত একজন সৎ ব্যক্তিকে মৃত্যুকূপে নিক্ষেপ করে হত্যা করতে চেয়েছিলো।

বনহুর নিশ্চুপ শুনে যাচ্ছিলো, বৃদ্ধ কিংকর রায়ের কথাগুলো, তার চোখের সম্মুখে প্রতিচ্ছবি হয়ে ফুটে উঠছিলো। মানুষের জীবনে এমনি করে কত ঘটনা ঘটে যায় যা এক সময় ইতিহাস রচনা করে।

মহারাজ কিংকর রায় এবার শয্যায় সোজা হয়ে বসলেন, তারপর তিনি বললেন–যদিও আজ জয়রাজ বা তার কন্যা জয়া আমার পাশে নেই, কিন্তু আছে আমার বিশ্বস্ত পারিষদবর্গ, আছে আমার মা শ্বেতা। বাবা তুমি যেই হও, তোমার চেহারা দেখে আমি বুঝতে পেরেছি তুমি সাধারণ ব্যক্তি নও......

বনহুর মহারাজ কিংকর রায়কে কথা শেষ করতে দিলো না, সে বললো–শ্বেতা চলে, মহারাজ বিশ্রাম করুন।

শ্বেতা উঠে দাঁড়ালো, বললো–চলো।

বনহুর আর শ্বেতা সেই বিস্ময়কর রাজকক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে এলো।

বনহুর বুঝতে পেরেছিলো মহারাজ কিংকর রায় কি বলতে চান। আপন মনে একটু হাসলো বনহুর।

*

দীর্ঘ সময় ধরে পাগলিনীর মত একাধারে পথ চলছে হুমায়রা। সে পথ চেনে না, কোথায় চলেছে সে তাও জানে না। বনবাদাড়, মরুভূমি–প্রান্তর, সব পেরিয়ে চলেছে হুমায়রা, কোন্ অজানার পথে।

যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন কোনো গাছের নিচে ঘুমিয়ে পড়ে। যখন ক্ষুধা পায় তখন গাছের ফল বা নদীর পানি পান করে ক্ষুধা নিবারণ করে।

হুমায়রার কাছে সব সময় একটি সূতীক্ষ্ণধার ছোরা থাকতো, সেই ছোরা তার বিপদের সম্বল। তবে তেমন কোনো বিপদের সম্মুখীন সে হয়নি, হলে ঐ সূতীক্ষ্ণধার ছোরাখানা তার কতখানি উপকারে আসবে তা এখনও জানে না সে। ভাগ্য ভালো তাই ভয়ংকর কোনো বিপদের মুখোমুখি এখনও তাকে হতে হয়নি।

হুমায়রা সাহসিনী, তাই বলে সে বীরাঙ্গনা নয়। শক্তি তার দেহে আছে তবে পুরুষদের শক্তির কাছে কতখানি টিকবে তাও সে জানে না। তবু তার ভরসা নিজের কাছের ছোরাখানা।

প্রায় পনের-ষোল দিন ধরে পথ চলছে হুমায়রা।

পা দুখানা তার অবশ হয়ে এসেছে।

কতদিন ধরে তার নাওয়া খাওয়া নেই।

চুলে জট ধরেছে।

শরীরে ময়লা জমেছে, হঠাৎ করে তাকে দেখলে যে কোন ব্যক্তি পাগলিনী ছাড়া কিছু ভাববে না। দু একবার ছোটাখাটো হিংস্র জীবজন্তুর আক্রমণ হয়েছে, তবে তার তেমন কোনো ক্ষতি সাধন হয়নি।

হুমায়রার চিন্তা তার ইন্দ্রনাথকে সে হারিয়েছে।

আর কোনোদিন সে তাকে পাবে না। জীবনে হুমায়রা কাউকে ভালবাসেনি, শুধু ভালবেসেছিলো ঐ একটি মাত্র তরুণকে, যে তার জীবনে নতুন এক স্বপ্ন গড়ে তুলেছিলো।

সন্ধ্যার অন্ধকার জমাট বেঁধে আসে।

হুমায়রা চারদিকে তাকিয়ে দেখছিলো, কোথায় কোনো আশ্রয় পায় কিনা। ক্ষুধা-পিপাসা তাকে কাতর করে তুলেছিলো। পা দুখানা চলছিলো না আর।

হঠাৎ হুমায়রা দেখতে পেলো অনতিদূরে আলো জ্বলছে। আশায় চোখ দুটো তার জ্বলে উঠলো।

হাঁটতে শুরু করলো হুমায়রা।

দৃষ্টি তার সম্মুখে।

বারকয়েক হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলো সে।

তবু আবার চলছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে গেলো হুমায়রা সেই উজ্জ্বল আলোকটির পাশে। হুমায়রা দেখলো একদল জোয়ান বলিষ্ঠ লোক আগুন জ্বেলে একটা জীবন্ত হরিণ দগ্ধ করছে। হরিণটার মুখ রশি দিয়ে বাধা থাকায় হরিণের দেহ অগ্নিগদ্ধ হলেও সে কোনো রকম শব্দ করতে পারছে না। যন্ত্রণায় দেহটা তার ভীষণভাবে নড়ছিলো। চারখানা পাও রশি দিয়ে বাঁধা, এবং পাগুলোর মধ্য দিয়ে একটি বাঁশ জাতীয় লাঠি বা শলাকা প্রবেশ করানো হয়েছে।

এ দৃশ্য দেখে হুমায়রা শিউরে উঠলো এবং সে দ্রুত পালানোর জন্য চেষ্টা করলো। কিন্তু পালানোর পূর্বেই ওরা হুমায়রাকে দেখে ফেললো।

একজন বলিষ্ঠদেহী লোক আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বললো–শিকার মিলে গেছে, ধরে ফেলো।

কথাটা কানে গেলো হুমায়রার।

সে ছুটতে শুরু করলো।

একে অন্ধকার তারপর বনবাদাড়, হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলো হুমায়রা।

ঠিক সেই মুহূর্তে ওরা ধরে ফেললো তাকে।

একে নাওয়া খাওয়া নেই। বড় দুর্বল তার শরীর। তার কাছে লুকানো ছোরাখানা বের করে এতটুকুও শক্তি ছিলো না তখন তার শরীরে।

দুষ্ট লোক দুজন হুমায়রার হাত দুখানা ধরে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে চললো।

বলিষ্ঠদেহী লোকটা সর্দার তাতে কোনো সন্দেহ নেই। লোক দুজন হুমায়রাকে ধরে তার সম্মুখে এনে হাজির করলো।

হরিণটা তখন মরে গেছে।

জীবন্ত হরিণের চামড়া–পোড়া গন্ধ স্থানটিকে দুর্গন্ধময় করে তুলেছিলো।

অগ্নিশিখার লালচে আলোতে লোকগুলোকে এক একটি শয়তান বলে মনে হচ্ছিলো। তাদের চোখেমুখে নরপশুর ক্ষুধা।

হুমায়রাকে দেখে তারা আনন্দধ্বনি করে উঠলো।

সর্দার বললো–ওকে বসিয়ে রাখো, খাওয়া শেষ হলে তামাসা দেখা যাবে। একজন বলিষ্ঠ লোক হুমায়রাকে বসিয়ে দিলো সর্দারের কাছাকাছি একপাশে।

হুমায়রার দুচোখে ভয়–ভীতি আর করুণভাব ফুটে উঠেছে। অসহায় চোখে তাকাচ্ছে সে ওদের সবার মুখের দিকে। বেশ কিছু দিন সে একা পথ চলছে কিন্তু এমন ভয়ংকর বিপদের সম্মুখীন সে হয়নি। আজ নিজকে ভীষণ অসহায় মনে করলো। একমাত্র সেই দয়াময় প্রভু ছাড়া তাকে উদ্ধার করার কেউ নেই। জড়োসড়ো হয়ে সে দয়াময়কে স্মরণ করতে লাগলো।

হুমায়রা লক্ষ করলো ওরা এবার খাওয়ার নেশায় মেতে উঠেছে। অর্ধ–দগ্ধ হরিণটা ছোরা দিয়ে কেটে কেটে খন্ড খন্ড করে ফেললো এবং সবাই হাতে তুলে নিলো এক একটি খন্ড।

একজন লোক হুমায়রার দিকে এক খন্ড বাড়িয়ে ধরলো।

ক্ষুধার্ত হুমায়রা ওর হাত থেকে একরকম প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে গো গ্রাসে খেতে শুরু করলো।

তারপর এক সময় খাওয়া শেষ হলো।

এবার হুমায়রার দিকে দৃষ্টি চলে গেলো সবার।

ওরা এক একজন এক একরকম মন্তব্য করতে শুরু করলো। সর্দার হাত বাড়ালো হুমায়রার দিকে।

হুমায়রা ছুটে পালাতে গেলো কিন্তু পারলো না। ওরা ধরে ফেললো হুমায়রাকে নিয়ে এলো তাকে পর্বতের নির্জন গুহায়।

ঐ দলে এক বৃদ্ধ ছিলো সে হুমায়রার মধ্যে দেখতে পেলো তার কন্যার মুখ। প্রথম হতেই ভীষণ ব্যথা পেলে সে হুমায়রার করুণ অবস্থা দেখে।

ওরা যখন হুমায়রার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছিলো তখন তার খুব খারাপ লাগছিলো।

নাম ওর মিহির আলী।

হুমায়রাকে লক্ষ করে তার বড় দুঃখ হচ্ছিলো, বারবার তার একমাত্র কন্যা নাসিমার কথা মনে পড়ছিলো। সে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো।

গভীর রাতে সমস্ত আড্ডাখানা যখন নিদ্রায় অচেতন তখন মিহির আলী চুপি চুপি শয্যা ত্যাগ করলো। কিন্তু সেই মুহূর্তে তার কানে এলো ভীষণ একটা আর্তনাদের শব্দ। ভাল করে তাকিয়ে দেখলো তার কন্যার মত মেয়েটা তাদের ঘুমন্ত সর্দারের বুকে একটা ছোরা বসিয়ে দিয়েছে।

পরক্ষণেই ছোরাটা টেনে তুলে নেয় হুমায়রা।

ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে।

আর্ত চিৎকারের শব্দে জেগে উঠেছে অন্যান্য দুস্কৃতিকারী, তারা এ দৃশ্য লক্ষ্য করে হতভম্ভ হয়ে পড়ে।

সবাই যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সর্দারকে ঘিরে ধরেছে তখন মিহির আলী হুমায়রাকে সরিয়ে নেয় সবার অগোচরে। ওর হাত ধরে ছুটতে শুরু করে মিহির আলী।

হুমায়রার দক্ষিণ হাতে এখনও রক্তাক্ত ছোরাখানা।

বাঁ হাতখানা মিহির আলীর হাতের মুঠায়।

অন্ধকার রাত বলেই কেউ তাদের দেখতে পায় না। কিন্তু যখন তারা সর্দারের হত্যাকারিণীর সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তখন আর তারা খুঁজে পায় না হুমায়রাকে। ওরা তন্ন তন্ন করে সন্ধান চালায়।

মিহির আলী চালাক এবং বুদ্ধিমান, সে এমন পথে আড্ডাখানা থেকে বেরিয়ে যায় যে পথ শুধু সে ছাড়া আর কেউ জানতো না। আর জানতো সর্দার।

নরপশু সর্দার মত্যুবরণ করেছে তাই মিহির আলী কতকটা নিশ্চিন্ত, তবু দৌড়ে যাচ্ছে সে হুমায়রাসহ, হঠাৎ যদি শয়তানরা টের পেয়ে যায় তাই দ্রুত চলেছে।

হুমায়রা কোনো আপত্তি না করে মিহির আলীর সঙ্গে দৌড়াচ্ছে। সে বুঝতে পেরেছে কাজটা সে ভাল করলেও এ মুহূর্তে তার জন্য ভীষণ বিপদজনক। মিহির আলীকে সে চেনে না, মিহির আলীর নামও সে জানে না, তবে হুমায়রা এটুকু বুঝতে পেরেছে লোকটা তার প্রতি সহানুভূতিশীল। এই বিপদ মুহর্তে তাকে রক্ষা করতে চায়, বাঁচাতে চায় ওদের কবল থেকে।

হুমায়রা আর চলতে পারছিলো না তবু তাকে দৌড়াতে হচ্ছে। রীতিমত হাঁপিয়ে পড়েছে সে।

অনেকক্ষণ দুটার পর মিহির আলী কথা বললো খুব কষ্ট হচ্ছে তোর, না রে?

হুমায়রা বললো–হাঁ।

তবে এখানে বসে পড়, আর দৌড়ে কাজ নেই। ওরা আর আমাদের খুঁজে পাবে না।

হুমায়রা আর চলতে পারছিলো না, ক্লান্ত অবসন্ন দেহে সে বসে পড়লো মাটিতে।

অদূরে বসলো মিহির আলী।

সেও বেশ ক্লান্ত। বয়স অনেক তবু দৈহিক শক্তি এবং বলিষ্ঠ চেহারা তাকে জোয়ান করে রেখেছে। চেহারা দেখলে তাকে ভাল মানুষ বলে মনে হয় না কিন্তু

আসলে লোকটা মহৎ, হৃদয়বান।

বললো সে হুমায়রাকে লক্ষ্য করে–ওরা তোক পেলে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবে। তোকে ওরা হত্যা করবে তার সঙ্গে আমাকেও।

বাবা, তুমি আমার জন্য নিজে কেন ওদের চক্ষুশূল হলে? আমার জীবনের কোনো মূল্য নেই। আমি সর্বহারা……দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ওঠলো হুমায়রা।

মিহির আলী উঠে এগিয়ে এলো, হুমায়রার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো–দেশে তোর মত আমার একটা বেটি আছে, তুই ঠিক তার মত দেখতে। তোর কেউ না থাক্ আমি আছি তো? যাবি মা আমার সঙ্গে আমার দেশে?

যাবো বাবা। আমাকে তুমি ঐ শয়তানদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে, কোনোদিন আমি তোমার ঋণ ভুলবো না।

*

মিহির আলী হুমায়রাকে নিয়ে এলো নিজের দেশে। অনেক পাহাড় পর্বত নদ–নদী পেরিয়ে, সে অতি গোপনে এসেছে। ওরা যদি হুমায়রা এবং মিহির আলীকে পেতো তাহলে নির্মমভাবে হত্যা করতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ওদের দষ্টি এড়িয়ে আসার জন্যই মিহির আলীকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। অনেক সাবধানে আত্মগোপন করে সে হুমায়রাসহ দেশে এসে পৌঁছেছে।

মিহির আলীর কন্যা হুমায়রাকে পেয়ে ভীষণ খুশি হলো। এমনকি মিহির আলীর স্ত্রী হুমায়রাকে কন্যাস্নেহে বুকে টেনে নিলো। স্বামীর মুখে হুমায়রার করুণ জীবন–কাহিনী শুনে তার চোখেও পানি এসে পড়েছিলো।

মিহির আলী আর তার স্ত্রী এখন এক কন্যা নয়–দুই কন্যা। নাসিমা আর হুমায়রা।

নাসিমা ভাল নাচতে জানে, তাই সে শহরে গিয়ে নাচ দেখিয়ে পয়সা উপার্জন করতো। এ ছাড়া তার মায়ের জীবন রক্ষার কোনো উপায় ছিলো না। স্বামী ডাকাত দলে যোগ দিয়ে দেশত্যাগী হয়েছিলো, তারপর থেকে মিহির আলীর কোনো সন্ধান মা আর মেয়ে পায়নি। মিহির আলীর আজ মনের দৃষ্টি খুলে গেছে, সে হুমায়রার মধ্যে দেখেছে তার কন্যার প্রতিচ্ছবি। কন্যার মুখ তাকে স্মরণ

করিয়ে দিয়েছে দেশে ফেরার কথা। হুমায়রাসহ তাই মিহির আলী ফিরে আসে নিজের দেশ সিকোমায়।

সিকোমা শহর ঝামদেশ থেকে প্রায় হাজার মাইল দূরে। এখানে মিহির আলী স্ত্রী, কন্যা এবং হুমায়রাকে নিয়ে পুনরায় সংসার গড়ে তোলে। কিন্তু তার কোনো রোজগার ছিলো না, এতদিন সে ডাকাতি করে যে অর্থ এবং সম্পদ লুটে এনেছে তা সবই সর্দারের হাতে তুলে দিতে হয়েছে। সর্দার যা তার খুশী তাই তার অনুচরদের বণ্টন করে দিতো। যা-ও সামান্য কিছু সে সংগ্রহ করে রেখেছিলো তাও তাকে ছেড়ে আসতে হয়েছে।

ডাকাত দলে যোগ দেয়ায় সমাজে তার কোনো স্থান ছিলো না। স্ত্রী এবং কন্যাকেও তাই কেউ আশ্রয় দিতে না বা কোনো সাহায্য তারা পেতো না কারও কাছে।

অনেক ব্যথা-বেদনা তাদের সহ্য করতে হতো। সমাজ থেকে মিহির আলীর পরিবার ছিলো বঞ্চিত। এমন কি লোকসমাজে মিহির আলী মুখ দেখাতে পারত না। কারণ সে ডাকাতদলে যোগ দিয়ে দেশত্যাগী হয়েছিলো।

মিহির আলী গ্রামে ফিরে আসায় স্ত্রী–কন্যা খুশি হলেও গ্রামবাসী খুশি হলো না, তারা তাকে দেখলে মুখ ফিরিয়ে নিতে দ্বিধাবোধ করতো না।

মিহির আলী বিব্রত মনে করতে লাগলো। শ্রমিক হিসেবেও সে কোথাও কাজ পেলো না।

একদিন মিহির আলী এক বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গেলো। ছোট বেলার বন্ধু এবং ভাইয়ের মত কিন্তু সেও মুখ ফিরিয়ে নিলো মিহির আলীকে দেখে।

ফিরে এলো মিহির আলী বাড়িতে। ব্যথা–বেদনায় জর্জরিত হলো তার হৃদয়। স্ত্রী, কন্যা এবং হুমায়রা মিহির আলীর চেহারা দর্শন করে চিন্তিত হলো।

স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলো–কি হয়েছে তোমার? দেশে ফিরে এলে, এ যে বড় আনন্দের কথা। আর তুমি সর্বদা বিষণ্ণ থাকো কেন?

বললো মিহির আলী–না, আনন্দের কথা নয়, আমার জীবনে এটা অভিশাপ। বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো মিহির আলীর গলা।

হুমায়রা আর নাসিমা পিতার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো। নাসিমার মতই হুমায়রা ভালবাসে মিহির আলীকে। মিহির আলী শুধু তার আশ্রয়দাতাই নয়, জীবনরক্ষকও। তাই ওর ব্যথায় নাসিমা যেমন ব্যথিত তেমনি ব্যথিত হুমায়রা।

নাসিমা কিছু বলতে যাচ্ছিলো, তখন বললো মিহির আলী–আমি ডাকাত ছিলাম বলে আমাকে সবাই ঘৃণা করে। আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নেয়।...কেউ আমাকে কোনো কাজ দেয় না, এমনকি আমার আত্মীয়–স্বজন, বন্ধু–ভাই সবাই আমাকে দেখলে সেখান থেকে পালায়, কারণ আমি অসৎ পথে গিয়েছিলাম... কিন্তু কেন, কেন আমি অসৎ পথে গিয়েছিলাম?

নাসিমা বলে ওঠে–বাবা, তুমি কেন অসৎ পথে গিয়েছিলে?

তুই জানিস না মা, কি দুঃখ আর ব্যথা নিয়ে আমি ঐ জঘন্য পথে পা বাড়িয়েছিলাম। ঘরে বুড়া বাবা-মা ছিলো। তোর মাকে বিয়ে করে কোলে বাচ্চা এলো–সে তুই। কারও মুখে খাবার নেই; দুঃখের সংসার, বাবা–মা খাটতে পারে না। আমি যা কামাই করি তা দিয়ে সংসার চলে না। তবু সারাদিন মজুর খাঁটি, সামান্য পয়সা পাই, তা দিয়ে কিছু হয় না। একটা চাকরি বাকরিও জোটে না আমার ভাগ্যে। বাবার কঠিন অসুখ, অনেক ওষুধ কিনতে হতো। ওষুধ কিনবো না খাবার কিনবো। কচি বাচ্চার মুখে এক ফোঁটা দুধ দিতে পারতাম না। বাবা মারা গেলো, মাকেও ঐ অসুখে ধরলো। আবার সেই ওষুধ আর সেই ভাল পথ্য। গায়ের রক্ত বিক্রি করেও আমি আমার বাবা–মাকে বাঁচাতে চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না। মাও মরলো, রক্ত বিক্রি করে শরীর খুব খারাপ হয়ে গেলো, বেশি খাটতে পারতাম না, তাই আমাকে কেউ আর কাজ দিতো না। ক্ষুধার জ্বালা...তারপর বাড়িতে বৌ–বাচ্চার কান্না আমার অসহ্য লাগতো। বুঝবি না মা, আমি কত দুঃখে বাড়ি ছেড়ে অসৎ পথে পা বাড়িয়েছিলাম। একদিন ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে একটা বড়লোকের বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। দেখলাম ওরা সামনের বাগানে বসে অনেক খাবার খেলে তারপর কুকুরটাকে মেলা খাবার খেতে দিলো। আমি ভাবলাম কুকুরটার সামনের খাবারগুলো সরিয়ে নেবো, তারপর করে বসলাম তাই। যেমনি চাকরটা কুকুরটার সামনে খাবারের থালাটা রেখে সরে গেছে, অমনি আমি দৌড়ে গিয়ে খাবারসহ থালাটা তুলে নিয়ে পালাতে গেলাম। কুকুরটা শিকলে বাঁধা ছিলো তাই আমার পেছনে ধাওয়া করতে পারলো না শুধু ঘেউ ঘেউ করে উঠলো ভীষণ ভাবে। সেকি চিৎকার, যেমন বাজখাই গলা তেমনি দুপায়ে মাটি আঁচড়াতে লাগলো। কুকুরটা বাঁধা থাকলে কি হবে,

দারোয়ান, পাহারাদার এরা আমাকে তাড়া করে ধরে ফেললো। শরীর খুব দুর্বল ছিলো তাই দৌড়াতে পারলাম না।...থামলো মিহির আলী, তার চোখেমুখে একটা ভয়ংকর বিদ্রোহী ভাব ফুটে উঠলো। দাঁতে দাঁত পিষে বললো সে ঐ দিন আমি দেখলাম মানুষ কত পাষন্ড, নির্দয় হতে পারে। আমাকে যখন ওরা ওদের মালিকের সামনে ধরে নিয়ে এলো তখন তার চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বের হচ্ছিলো। শংকর মাছের চাবুক দিয়ে আমাকে প্রহার করা হলো, দারোয়ান পাহারাদার সবাই আমার শরীরটাকে থেতলে দিলো সামান্য একটু খাবারের জন্য তাও উচ্ছিষ্ট কুকুরের খাবার......যখন আমাকে ওরা বেদম প্রহার করছিলো তখন আমি ভাবছিলাম আমার মত হাজারও দুঃখী মানুষের কথা, যারা ক্ষুধার জ্বালায় পেটের দায়ে আমারই মত নির্মম যন্ত্রণা আর অবিচার পেয়ে চলেছে। এক শ্রেণীর মানুষ যারা সভ্য সমাজের শিয়োমণি, যারা উদর পূর্ণ করে উচ্ছিষ্ট খাবার কুকুরের সামনে তুলে দেয় যারা ডাষ্টবীনে খাবার নিক্ষেপ করে, তারা সমাজের নেতা মহান অধিপতি। আর এক শ্রেণীর লোক কুকুরের খাবার নিয়ে করে কাড়াকাড়ি, ডাষ্টবীন হাতড়ে ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টা করে তারাই পায় সভ্য সমাজের কাছে প্রহার, লাথি–ঝাটা। তবু বাঁচতে হবেতো, তাই লাথি–ঝাটা খেয়েও ওরা মেরুদন্ড সোজা করে উঠে দাঁড়ায়। আবার তারা সভ্য মানুষগুলোকে শ্রম দিয়ে, সম্মান দিয়ে দেহের রক্ত দিয়ে সুউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করে রাখে। আমি আর ফিরে এলাম না, আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠলো, আমি চলে গেলাম, পা বাড়ালাম অন্যায় পথে। থামলো মিহির আলী।

হুমায়রা আর নাসিমা শুনে যাচ্ছিলো সব কথা।

একটু থেমে বললো মিহির আলী–আমি যেদিন অন্যায় কাজে লিপ্ত হলাম সেদিন আবার আমার মনে উদয় হয়েছিলো সেই মানুষগুলোর কথা যারা সভ্য সমাজের কাছে লাথি–ঝাটা আর তিরস্কার পেয়ে অসৎ পথে আমারই মত পা বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি ডাকাত হলাম, পেট পুরে খেতে পেলাম। আবার স্বাস্থ্য ফিরে এলো। কিন্তু মনের শান্তি ফিরে পেলাম না, সব সময় মনে পড়তে স্ত্রী–কন্যা আর মরা বাবা–মার কথা। ধনী ব্যক্তিদের মাথায় বাড়ি দিয়ে তাদের ধন ছিনিয়ে নেয়াই হলো আমার কাজ। আমি অসহায় গরিব, তাদের কোনো ক্ষতি সাধন করিনি। আমি যখন ডাকাতি করতাম তখন বেছে বেছে করতাম। কিন্তু সেখানেও আমার কোনো অধিকার ছিলো না। আমরা ডাকাতি করে মালামাল ছিনিয়ে আনতাম, সর্দার এবং তার সঙ্গী যারা শক্তিশালী সর্দারের মত, তারা আমাদের সব নিয়ে সামান্য কিছু দিতো যা আমাদের উদর পূর্ণ করতেই খরচ হয়ে যেতো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললো মিহির আলী–দেখলাম গোটা পৃথিবী একই ধারায় চলছে। সমাজপতি আর সাধারণ মানুষে যে ফাঁক সে ফাঁক সব জায়গায়ই রয়েছে। সবল যারা তারা দুর্বলকে মেরে খাচ্ছে, নেতা যারা তারা সাধারণ মানুষকে শুষে নিচ্ছে, সমাজপতি যারা তারা সমাজের মেরুদন্ড ভেঙে দিচ্ছে, অসহায় মানুষের রক্ত নিয়ে হোলি খেলছে। দুর্বলের স্থান কোথাও নেই....ফিরে এসে ভাবলাম সৎ মানুষের মত খেটে খাবো কিন্তু কেউ আমাকে কাজ দেয় না, সবাই আমাকে দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি কি করবো বল? আমি কি করবো এখন?

নাসিমা পিতার চোখের পানি মুছে দিয়ে বলে–বাবা, তুমি ডাকাত ছিলে তাই সমাজ আমাদের স্থান দেয়নি। কেউ আমাদের প্রতি সদয় হয়নি। আমরা কারও কাছে কোনো সাহায্য পাইনি তবুও তো বেঁচে আছি। আমি নাচ দেখিয়ে পয়সা উপার্জন করি, তাতেই আমাদের সংসার চলে যায়। এখনও নাচবো। তখন মা আমার সঙ্গে থাকতো এখন থাকবে তুমি। বোন হুমায়রা, তুই নাচবি আমার সঙ্গে?

হুমায়রা নাচতে জানে না তবু বলে সে–তুই শিখিয়ে দিলে পারবো।

মিহির আলী হাতের পিঠে চোখ মুছে, ভাবে সে মেয়ে নাচ দেখিয়ে কামাই করবে আর বাপ তাই খাবে তা হয় না, আবার সে অসৎ হবে...

বলে নাসিমা–বাবা, তুমি কিছু ভেবো না। জান বাঁচানোর জন্য আমরা সব করতে পারি তবে পাপ কাজ করতে পারি না যা তোমার মুখে চুনকালি মাখাবে।

পেটের দায়ে মিহির আলী কন্যার প্রস্তাব মেনে নিলো এবং নাসিমা শহরে গিয়ে পূর্বের মত নাচ–দেখিয়ে পয়সা রোজগার করতে লাগলো।

এখন মা যায় না, যায় মিহির আলী

নাসিমা যখন নাচে মিহির আলী বাজনা বাজায়।

হুমায়রার কিন্তু মোটেই বসে থাকতে ভাল লাগে না, সে কাজ চায়। কাজ না করলে যেন হাঁপিয়ে ওঠে। শুধু শুধু সময় কাটতে চায় না। তা ছাড়া নিরিবিলি থাকলে মনে পড়ে তার ইন্দ্রনাথের কথা। কেমন করে সে তার ইন্দ্রনাথকে ভুলবে, কিছুতেই মন থেকে তাকে মুছে ফেলতে পারে না। হুমায়রা জানে প্রেম পবিত্র, যদি তা কলঙ্কের কালিমায় পাপময় না হয়। হুমায়রা আর জাভেদের মধ্যে কোন

পাপের ছোঁয়া লাগেনি। হুমায়রা নিজের প্রেমকে পবিত্র নিষ্পাপ ভালবাসা বলেই জানে। ইন্দ্রনাথের কথা তার শয়নে স্বপনে এমন কি জাগরণেও সর্বক্ষণ স্মরণ হয়।

তাই সে নিজকে নিজের কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে চায়। হুমায়রা নাসিমার কাছে নাচ শিখতে লাগলো। সেও যাবে তার সঙ্গে, শহরে নাচ দেখিয়ে পয়সা কামাই করবে। মিহির আলী তার বাবার মত, তার স্ত্রী মায়ের মত। হুমায়রার স্মরণ হয় না মা–বাবাকে! নাসিমার মা–বাবা তার পরম শ্রদ্ধার জন, তাদেরকেই হুমায়রা মা বাবার আসনে প্রতিষ্ঠা করেছে এবং তাদের মঙ্গল এখন তার কামনা। যে মিহির আলী তার জন্য নিজের পেশা ত্যাগ করে ফিরে এলো সমাজে কিন্তু সমাজ তাকে স্থান দিলো না। তাকে তো বাঁচাতে হবে, হুমায়রা চায় মিহির আলীর সব দুঃখ–কষ্ট ব্যথা বেদনা উপশম করতে।

হুমায়রার প্রচেষ্টা সার্থক হলো, সে নাসিমার মতই নাচতে শিখলো। আবার সে ফিরে পেলো নতুন জীবন। নাসিমা আর হুমায়রাসহ মিহির আলী প্রতিদিন যায় শহরে এবং নাচ দেখিয়ে পয়সা রোজগার করে। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে আসে তারা। বাড়ি ফিরে খাওয়া দাওয়া সেরে হাসিগল্পে মেতে ওঠে ওরা সবাই। সমস্ত দিনের কাহিনী শোনায় মা জরিনাকে।

মা জরিনা ওদের গল্প শুনে কখনও হাসে, কখনও দুঃখ করে, আবার কখনও রেগে আগুন হয়। মাঝে মাঝে স্বামীর ওপর ভীষণ চটে যায় সে, কারণ তার স্বামী সংসার চালাতে অক্ষম বলেই আজ মেয়েকে নাচতে হয়। নাচ দেখিয়ে পয়সা কামাই করা এটা যে কত দুঃখের তা জরিনা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে। পুরুষদের নানা ধরনের ইংগিতপূর্ণ বাক্যবান জরিনাকে বিদগ্ধ করেছে কত অসংলগ্ন কথা শুনতে হয়েছে। আগে জরিনাই নাসিমার সঙ্গে যেতো, সে বাজনা বাজাতো নাসিমা নাচতে। এ ছাড়া বাঁচার কোনো পথ ছিলো না, নইলে না খেয়ে মরতে হতো তিল তিল করে। তখন যেন গা সওয়া হয়ে গিয়েছিলো ব্যাপারটা। পুরুষগুলোর ইংগিতপূর্ণ বাক্যবান নীরবে সহ্য করতে পারতো। এখন মন তার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ভাবে, স্বামী ফিরে এসেছে তবু মেয়েকে নাচতে হচ্ছে, তবু মেয়েকে শুনতে হচ্ছে সেই পাপময় কথাগুলো, হজম করতে হচ্ছে সেই নিষ্ঠুর বাক্যবাণগুলো।

যখন জরিনা ক্ষেপে যায় তখন সবাই চুপ হয়ে থাকে। কারণ জরিনা যা বলে তা মিথ্যা নয়। ক্ষেপলে জরিনা বক বক করতে থাকে। জন্মাবার পর থেকেই দুঃখ

আর ব্যথা তার জীবনটাকে থেতলে দিয়েছে। বাপ ছিলো শ্রমিক, সারাদিন খেটেখুটে যা আনতে মা মেয়ে আর তিন ছেলে মিলে খেতো। একজনের কামাইয়ের ওপর কয়েকজন খেতো। সংসারে অভাব লেগেই থাকতো। মা ধনবানদের বাড়ি কাজ করতো, কতদিন মায়ের সঙ্গে গিয়ে দেখেছে মাকে কত লাঞ্ছনা–গঞ্জনা সহ্য করতে হতো। পেটের জ্বালায় সামান্য খাবারের জন্য কত কিছু নীরবে সহ্য করতে দেখেছিলো জরিনা তার মাকে। শ্রমিক বাবাকেও কোনোদিন হাসিমুখে ফিরতে দেখেনি। কোনোদিন বরং পিতাকে জরিনা ফিরে এসে চোখের পানি মুছতে দেখেছে। এত বেশি সেদিন না বুঝলেও, বেশ বুঝেছে তার বাবাকে কেউ হয়তো ঠকিয়েছে, নয় অপমানিত করেছে। যারা ধনবান, ঐশ্বর্যের ইমারতে বসে যারা দিন কাটায় তারাই অসহায় মানুষদের ঠাকায়, লাঞ্ছিত–অপমানিত করে–এমনকি নির্মম আঘাত করতেও ছাড়ে না তারা।

জরিনা রেগে গেলে গালমন্দ করতে থাকে ঐসব অমানুষগুলোকে। জরিনা ওদের অমানুষ বলে, কারণ লেখাপড়া শিখে উচ্চ ডিগ্রি নিয়েও যারা মিথ্যা কথা বলে, অসৎ কাজ করে, সরল সহজ মানুষগুলোকে চরমভাবে ঠকায়, এরা মানুষ নয়–মানুষনামী পশু।

জরিনা সব সময় রাগ করে বলে জানোয়ারগুলো চিরকাল দেশটাকে জ্বালিয়ে–পুড়িয়ে খাবে। ওরা কোনোদিন মরবে না, ওদের বংশ কোনদিন ধ্বংস হবে না, কারণ তেলাপোকা চিরকাল একই রকম থাকবে, পাল্টাবে না কোনোকালে। ওরা তেলাপোকা।

কথাগুলো শুনে হাসতে নাসিমা, বলতো–মা, তেলাপোকার ওপর তোমার এত রাগ কেন? ওরা তো তোমার কোনো ক্ষতি করেনি।

জরিনা খ্যাক করে উঠতো, বলতো–তুই বুঝবি না। এখন তোর জোয়ানি আছে। রক্তের তেজ কমে গেলে বুঝবি আমার কথার মানেগুলো।

নাসিমা হেসে বলতো–কে বলে আমি বুঝিনা? সব বুঝি মা, সব বুঝি। মুখোশধারী সৎব্যক্তিদের আমি চিনিনা? সমাজের নেতা সেজে ওরা আমাদের দেশের সম্পদ লুটে নিয়ে নিজেদের হিসেবের অঙ্ক গগনচুম্বী করে তুলছে। সত্যিই বলেছো মা, ওরা তেলাপোকাই বটে। হাঁ, তেলাপোকার যেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি তেমনি ওদেরও। ওরা যেমন নরপশু ছিলো আজও তাই আছে। বদলাবে না কোনোদিন।

মিহির আলীর মত লোক যারা তারাও জন্মাবে। সমাজের কাছে লাঞ্ছিত অপমানিত অবহেলিত হয়ে আসছে, আসবেও, কেউ তা রোধ করতে পারবে না। কেউ তাদের দুঃখকষ্ট মুছে দিতে পারবে না। এরা নিষ্পেষিত হবে চিরকাল।

হুমায়রা আর নাসিমাকে নিয়ে প্রতিদিনের মত আজও চললো মিহির আলী রাজধানীর দিকে।

*

নিশ্চুপ বসেছিলো বনহুর।

ভূগর্ভে হলেও রাজা কিংকর রায় তার রাজপ্রাসাদের সৌন্দর্য মনোরম দৃশ্যে ভরপুর করে রেখেছিলেন, না অপরূপ বলা যায়।

বনহুর প্রাণভরে এসব লক্ষ্য করতো।

ভূগর্ভে নকল ঝরণাধারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকেও যেন হার মানায়। ঝরণার দু পাশে সুন্দর। বসার আসন রয়েছে। শ্বেতপাথরে তৈরি আসনগুলো মণিমুক্তাখচিত। ভারী সুন্দর। বনহুর এই আসনগুলোর একটিতে বসেছিলো। ভাবছিলো, তার জীবন বৈচিত্রে ভরা, সে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে বহুবার বহু নতুন অধ্যায় আবিষ্কার করেছে। মৃত্যুকূপ তার জীবনে বিস্ময়কর এক আবিষ্কার। রাজা কিংকর রায় আজ বৃদ্ধ, তার সারাটা জীবন পৃথিবীর আলো বাতাস ছাড়া সূর্যবিহীন রাজ্যে তিল তিল করে বেড়ে উঠেছে। কিশোরকাল হতে আজ এই বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত ভূগর্ভে জীবন যাপন করেছে। পৃথিবীর আলো–বাতাস তাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। সত্য এক অভিনব জগৎ এটা……

কি ভাবছো মহাপুরুষ?

চমকে ফিরে তাকালো বনহুর–শ্বেতা তুমি!

কি ভাবছিলে?

শ্বেতা, তোমার সম্বোধন আমাকে বিস্মিত করেছে। মহাপুরুষ কে?

তুমি!

হেসে উঠলো বনহুর। দীর্ঘ সময় শ্বেতার সান্নিধ্যে কাটিয়ে বনহুর তার ভীষণ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে। এমন কোনো স্থান ভূগর্ভে নেই যা শ্বেতা বনহুরকে দেখায়নি। এমনকি যে সুড়ঙ্গপথ দিয়ে পৃথিবীর বুকে ফিরে যাওয়া যায় সেই গোপন পথও বনহুরকে দেখিয়েছে শ্বেতা। কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে যাবার যে কৌশল, সুড়ঙ্গমুখের লৌহ দরজা খোলার চাবিকাঠি তা বনহুর জানতে পারেনি। এটা শ্বেতাও জানে না, জানলে হয়তো পৃথিবীর বুকে বেরিয়ে আসার লোভ শ্বেতা দমন করতে পারতো না।

কিংকর রায় নিজেও পৃথিবীর আলো–বাতাস সহ্য করতে পারতেন না। তাই তিনিও কোনোদিন এ পথে ভূগর্ভ থেকে বের হননি। জয়রাজ তাকে জীবিত রাখার জন্য প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করেছিলো এবং জয়ী হয়েছিলেন তিনি। কুচক্রী সেনাপতি রাঘবলালের হাত থেকে রাজবংশ রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন জয়রাজ।

বনহুরকে হাসতে দেখে বললো শ্বেতা–হঠাৎ এমন করে হাসলে কেন?

তোমার কথায়। মহাপুরুষ যাকে ভাবছে তার আসল পরিচয় জানলে ঐ নাম তুমি উচ্চারণ করতে না। ভূগর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে, পৃথিবীর কঠিন রূপ তোমাকে স্পর্শ করেনি, তাই তুমি সব কিছুই সুন্দর মনে করো।

পৃথিবীর রূপ আমি স্বচক্ষে না দেখলেও পথিবীর সৃষ্টি আমার কাছে অপরিচিত নয়। যেমন তুমি কত সুন্দর দেবতার মত, মহাপুরুষ বলবো তোমাকে।

শ্বেতা!

হাঁ তুমি দেবরাজ। তোমার সৌন্দর্যই শুধু আমাকে বিমুগ্ধ করেনি, তোমার আচরণ আমাকে অভিভূত করেছে। এই ভূগর্ভে যত পুরুষ আমি দেখেছি কিন্তু তোমার মত কাউকে দেখিনি। তুমি মহাপুরুষ। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

বনহুর বিস্ময়ভরা চোখ নিয়ে তাকালো শ্বেতার মুখের দিকে। রাজকন্যা শ্বেতা বলে কি? বিয়ে! তাকে বিয়ে করতে চায় শ্বেতা। কোনো মেয়েকে এমন স্পষ্টভাবে বিয়ের কথা বলতে শোনেনি কোনোদিন বনহুর। ভূগর্ভবাসিনী শ্বেতা মনের ইচ্ছা আজ অকপটে প্রকাশ করলো। একদিন মহারাজ কিংকর রায়ের মুখেও যৎসামান্য একটু আভাস পেয়েছিলো বনহুর, বলেছিলেন মহারাজ কিংকর রায়,

তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে। তোমার চেহারা, তোমার ব্যবহার আমাকে অভিভূত করেছে, আমি তোমায় নিজের করে নিতে চাই......

রাজা কিংকর রায়ের কথার আসল মানে কিছুটা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলো সেদিন বনহুর। তার মুখে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠেছিলো, অবাক চোখে তাকিয়েছিলো সে রাজা কিংকর রায়ের মুখের দিকে। আজ শ্বেতার মুখে কথাটা শুনে বিস্মিত হলেও একেবারে অবাক হলো না।

হেসে বললো–আমার আসল পরিচয় তোমার জানা দরকার শ্বেতা।

অনেক কটা দিন পেরিয়ে গেছে, তাই বনহুরও শ্বেতার কাছে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। কথাবার্তা বলতে আজ আর তেমন কোনো দ্বিধা বোধ হয় না তার। অবশ্য বনহুর এমন এক ব্যক্তি যার মধ্যে কোনো অহেতুক সংকোচবোধ ছিলোও না কোনোদিন। ন্যায় কথা বলতে তার কোনো সময় দ্বিধাবোধ হতো না। আজও সে শ্বেতার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলছে।

শ্বেতা বললো–পরিচয় আমার কোনো দরকার হচ্ছে না, কারণ তুমি আর কোনোদিন ফিরে যেতে পারবে না পৃথিবীর বুকে।

উঃ! কি নির্মম কথা শোনালে শ্বেতা? জীবনে যখন বেঁচে আছি তখন আমাকে আমার কর্তব্য পালন করতে দাও।

আমার বাবার ইচ্ছা তোমার হাতে আমাকে অর্পণ করেন। জানো তো আমার বাবা এই ভূগর্ত রাজ্যের রাজা। তার বিনা অনুমতিতে এখানে কোনো কাজ হয় না। তিনি যা ভাববেন বা করবেন তাতেই সবাইকে রাজি থাকতে হয়। আমার বয়স হয়েছে, কাজেই আমাকে নিয়ে বাবার চিন্তা...তুমি অমত করো না।

বনহুর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে, কারণ এমন প্রকাশ্যভাবে কোনো মেয়েকে সে আজ পর্যন্ত বিয়ের প্রস্তাব আপন মুখে করতে শোনেনি। বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলো বনহুর শ্বেতার মুখের দিকে। সরল সহজ সে মুখ, পাপময় চিহ্নের কোনো আভাস পাওয়া যায় না সে মুখে।

বনহুর বললো–শ্বেতা, তোমার কথাগুলো আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে। কারণ আমার জীবনের সঙ্গে তোমার জীবন কোনো মতেই খাপ খাবে না। যদি আমার সবকিছু শোনো তাহলে বুঝবে আমি মিথ্যা বলছি না।

শ্বেতা বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো।

ওর নিঃশ্বাস বনহুরের দেহ স্পর্শ করছে।

কোমল হাত দুখানা দিয়ে বনহুরের কণ্ঠ বেষ্টন করে বললো শ্বেতা–বলল, তোমার সব কথা শুনবো।

বনহুর নিষ্পলক চোখে তাকালো শ্বেতার মুখের দিকে।

শ্বেতা বললো–তুমি অমন করে আমার দিকে তাকিয়ে কি দেখো বলল তো?

তোমার মধ্যে আবিষ্কার করতে চাই তোমার আসল রূপ। তোমার ভিতর এবং বাহিরটা।

তুমি যখন আমার দিকে নির্বাক চোখে তাকিয়ে থাকো তখন আমার খুব ভাল লাগে। তোমার নীল দীপ্ত চোখ দুটো আমাকে আত্মহারা করে। বনহুর, তোমার পরিচয়ে আমার কোনো প্রয়োজন নেই, আমি তোমাকে ভালবাসি..

শ্বেতা, এ তুমি কি বলছে!

সত্যি তোমার আবির্ভাব আমার জীবনকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। তোমাকে আমি কোনোদিন যেতে দেবো না।

বনহুর নিশ্চুপ হয়ে তাকিয়ে থাকে শুধু, ভাষা যেন তার হারিয়ে গেছে। দুর্দান্ত দস্যু সর্দার বনহুর প্রস্তরমূর্তির মত যেন স্থির হয়ে গেছে।

ওর হাত ধরে বলে শ্বেতা–চলো আমরা দুজন বাবার কাছে যাই।

কেন?

বলবো বিয়েতে তুমি রাজি।

শ্বেতা, যা সম্ভব নয় তা হয় না। তোমার চেয়ে আমার বয়স অনেক বেশি। তা ছাড়া আমার আসল পরিচয় তুমি জানো না, জানলে কিছুতেই আমাকে বিয়ে করতে চাইতে না। আমার.......

চুপ, করো আমি সব বুঝি। বয়স তোমার বেশি কিন্তু আমারও কম নয়। যোগ্য পাত্রের অভাবে বাবা আমার বিয়ের কথা ভাবেননি কোনোদিন। তোমার সৌম্য সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা, তোমার ব্যবহার আমার বাবাকে মুগ্ধ করেছে, আমি নিজেও অভিভূত হয়েছি। আমি তোমার মত কাউকে দেখিনি আজ পর্যন্ত।

কিন্তু……

বল কিন্তু কি?

আমি বিবাহিত এবং আমার সন্তান আছে…..

বনহুর ভেবেছিলো তার কথা শুনে শ্বেতার মধ্যে বিরাট একটা পরিবর্তন আসবে কিন্তু তার মুখমন্ডল ঠিক পূর্বের মত স্বাভাবিক রইলো। সে বললো–ওসবে আমার কোনো ক্ষতি হবে না। আমি শুধু তোমাকে ভালবাসি….

শ্বেতা, আমার অনেক কাজ আছে পৃথিবীর বুকে।

তুমি তো মৃত্যুবরণ করেছে মৃত্যুকূপ গহ্বরে। তোমার ফিরে যাওয়ার কোনো কথা নেই।

কিন্তু আমাকে যেতেই হবে যেহেতু আমি জীবিত আছি। মৃত্যু আমার ঘটেনি তাই……

শ্বেতার মুখমন্ডল ভীষণ গম্ভীর হয়ে পড়ে। অভিমান আর রাগে চলে যায় শ্বেতা সেখান হতে।

বনহুর নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে, তার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে বনহুর আপন মনে।

সমস্ত দিন শ্বেতা বনহুরের সঙ্গে দেখা করলো না। প্রতিদিন তো সময় অসময়ে বনহুরের পাশে ছুটে আসতো, নানা গল্প করে সময় কাটতো বনহুরের। আজ শ্বেতা না আসায় বড় খারাপ লাগছিলো তার। ওর সঙ্গ আজকাল বনহুরের একান্ত কামনার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। বনহুর তা এই মুহূর্তে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে। মৃত্যুকূপের অভ্যন্তরে একান্ত একা নিঃসঙ্গ লাগে তার। শ্বেতাই যেন তার একান্ত আপনজন এই ভূগর্ভের অতলে।

বনহুরের জন্য নির্দিষ্ট একটি কামরা দেওয়া হয়েছিলো, সেই কামরায় থাকতো বনহুর। শ্বেতা সেখানেই হঠাৎ করে যখন তখন এসে পড়তো। উচ্ছল ঝরণার মত কখনও, কখনও দমকা হাওয়ার মত, কখনও আবার মন্থর গতিতে, শ্বেতাকে বনহুর নানা সময় নানাভাবে দেখেছে।

শ্বেতার মধ্যে কোনো দ্বিধা বা সংকোচ ছিলো না, সে বনহুরকে বন্ধুর মত দেখতে এবং সেইভাবে তার সঙ্গে আচরণ করতো। বনহুর শ্বেতাকে এড়িয়ে চলতে চাইলেও পারতো না, কারণ এমনভাবে শ্বেতা তাকে ঘিরে রেখেছিলো যেখানে তার কাছে পরাজিত হয়েছিলো, শ্বেতার শুভ্রবসন তাকে রজনীগন্ধার মত সুন্দর করে তুলেছিলো।

বনহুর নিজের মনে একটা দুর্বলতা অনুভব করতে লাগলো। শ্বেতার মেলামেশা তার জীবনকে অন্য পথে নিয়ে যেতে পারে, তাই বনহুর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে যেতে চায় শ্বেতার সান্নিধ্য থেকে।

বনহুর তার নির্জন গৃহে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলো রহমান ও তার ডুবুজাহাজের কথা। অনুচরগণ ও রহমান হয়তো বা ঝাম শহরে সন্ধান চালিয়েছে, বহুস্থানে খোঁজ করেছে, তারপর হতাশ হয়ে ফিরে গেছে। নিশ্চয়ই আস্তানায় এ সংবাদ সবাই জেনে ফেলেছে–সর্দার ঝম শহরে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। হয়তো বা আস্তানার সবাই ভীষণ ঘাবড়ে গেছে। নূরীর জন্য চিন্তা হয় বনহুরের, কারণ সবচেয়ে নূরী যেন অবুঝ বেশি। তাকে না পেয়ে নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে হয়তো। ভাবে জাভেদের কথা, হুমায়রা কোথায় গেলো, সে জীবিত আছে কিনা তাই বা কে জানে। মৃত্যুকূপ তাকে বন্দী করে রেখেছে। শ্বেতাই শুধু নয়, বৃদ্ধ মহারাজ কিংকর রায়ও তাকে চিরকালের জন্য বন্দী করতে চায় কিন্তু তা সম্ভব নয় কোনোদিনই……

হঠাৎ পদশব্দে ফিরে তাকায় বনহুর।

শ্বেতা ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

বনহুরের দৃষ্টির সঙ্গে বিনিময় হতেই শ্বেতা বলে উঠলো–আবার এলাম। যদিও তুমি আমার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে চাও তবুও ক্ষমা করলাম। যেতে তুমি পারবে না কোনোদিন।

শ্বেতা!

হাঁ, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

এত জেনেও তুমি......

চুপ করো, তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না।

শ্বেতা, তুমি রাজকন্যা আর আমি একজন দস্যু।

দস্যু!

হাঁ

তুমি দস্যু! না না, আমি বিশ্বাস করি না।

যা সত্য তা তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে। একটা দস্যুর জীবনের সঙ্গে তোমার মিলন কিছুতেই সম্ভব নয়।

শ্বেতার গন্ড বেয়ে নেমে এলো অশ্রুধারা, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো সে, তুমি দস্যু– সত্যি...সত্যি বলছো?

যতদূর সম্ভব আমি মিথ্যা বলি না, তুমি বিশ্বাস করো আমি সত্যি বলছি......।

চুপ করো, আমি শুনতে চাই না। আমি ভাবতে পারি না তুমি...তুমি একজন দস্যু। আমার বাবা মানুষকে ভালবাসেন, আমিও। কিন্তু দস্যু বা পাপীকে বাবা মোটেই সহ্য করতে পারেন না, আমিও না।

হাঁ, আমি নিজেও নিজকে ঘৃণা করি।

তুমি নিজকে নিজে ঘৃণা করো?

হাঁ, কারণ আমার বিবেকের কাছে আমি অপরাধী।

বনহুর, তোমাকে যত দেখছি তত অবাক হচ্ছি। তোমার আচরণ তোমার কথা আমার জীবনকে এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। চাইলেই কিছু পাওয়া যায় না

তা বেশ করে বুঝলাম। আমি চেয়েছিলাম তোমাকে, কিন্তু পেলাম না। আর কোনোদিন আমি কিছু পাবার আশা করবো না। তোমাকে পেয়ে আমার বান্ধবীদের সঙ্গ শেষ করেছিলাম। আর ওদের সঙ্গ আমাকে আনন্দ দিতো না। তোমার সঙ্গ পাবার জন্য আমি সদাসর্বদা ব্যাকুল থাকতাম। কিন্তু আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ, তাই জন্মাবার পর মাকে হারিয়েছি–বাবা যথেষ্ট স্নেহ করেন তবু যেন কোথায় একটা ফাঁক রয়ে গেছে যা পূর্ণ হয় না।

পৃথিবীটা বড় কঠিন স্থান। এখানে বাঁচতে হলে–সংগ্রাম করে বাঁচতে হয়। শ্বেতা, তুমি ভূগর্ভের মানুষ, বাস্তব জগৎ থেকে অনেক দূরে, তবু তুমি অনেক জানো, অনেক বোঝো–সত্যি আমি তোমার কথা শুনে ভীষণ অবাক হয়ে যাই। এত জানলে কেমন করে, এত বোবঝাই বা কেমন করে! শ্বেতা, তোমাকে খুশি করতে পারলে আমি ধন্য হতাম কিন্তু তোমার ইচ্ছা আমি পূর্ণ করতে পারলাম না...... মুখখানা ফিরিয়ে তাকালো বনহুর শ্বেতার পদদ্বয়ের দিকে।

শ্বেতা বললো–বনহুর, আমি অবুঝ নই। তুমি দস্যু–এ কথা বলে ভালই করেছো, নাহলে আমি ভুল করতাম। আমার বাবাও দুঃখ পেতেন। আমি বাবাকে বলবো তিনি যেন তোমাকে পৃথিবীর বুকে পৌঁছে দেন। যদিও আমার খুব খারাপ লাগবে তবুও বাবাকে বলবো।

*

বনহুরের বেশ খারাপ লাগছিল কারণ মনের গহনে কখন শ্বেতা আসন করে নিয়েছিলো কিছুটা যা বনহুর বিদায় মুহূর্তে অনুভব করলো গভীরভাবে।

তাকালো বনহুর শ্বেতার শ্বেতপদ্মের মত কোমল মুখমন্ডলের দিকে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার বুক চিরে।

শ্বেতার মুখে পূর্বের মত হাসির আভাস পরিলক্ষিত হচ্ছে। যদিও ওর অন্তরেও একটা বিষাদের কালো মেঘ ছেয়ে আসছিলো তবুও নিজকে সাবধানে সংযত রেখেছিলো সে।

রাজা কিংকর রায় বনহুরকে লক্ষ্য করে বললেন–আমি তোমার সত্যবাদিতা লক্ষ্য করে মুগ্ধ হয়েছি। তুমি দস্যু হলেও এক মহান ব্যক্তি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যাক বৎস, আমি আশীর্বাদ করি সুন্দর হোক তোমার জীবন।

বনহুর কিংকর রায়ের এক বিশ্বস্ত দূতের সঙ্গে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো রাজদরবার হতে। ভূগর্ভে তার নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে বিস্ময়ভরা অন্তরে এক সময় পৃথিবীর মুক্ত আকাশের তলে এসে দাঁড়ালো।

চারদিকে দুর্গম পর্বতমালা, পাদদেশে ঘন জঙ্গল আর জঙ্গল, তারই মধ্য দিয়ে বনহুর অগ্রসর হলো।

মুক্ত বাতাসে মন তার উড়ে যেতে চাইলো, কিন্তু ক্ষুদে ওয়্যারলেসটা হারিয়ে গেছে, কোনো সংবাদ পাঠাতে পারেনি তার নিজের আস্তানায়।

প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিলো বনহুর।

তাকালো সে আকাশের দিকে। তারাভরা আকাশটাকে বুটিদার গালিচা মনে হচ্ছে। হিমেল হাওয়া বইছে। কিংকর রায়ের বিশ্বস্ত দূত বিদায় সম্ভাষণ জানালো।

বনহুর বললো–যাও দূত, মহারাজ আর শ্বেতাকে আমার শুভেচ্ছা জানাবে।

দূত চলে গেলো।

বনহুর অন্ধকারে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো যে পথে দূত চলে গেলো সেই পথের দিকে। বনহুর এত বিপদেও ধৈর্য হারায়নি, সে নিজকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করলো পৃথিবীর বুকে।

বারবার শ্বেতার মুখখানা ভেসে উঠতে লাগলো তার মানসপটে। সত্যি বিস্ময়কর নারী। শ্বেতা। যে নারী সূর্যের রশ্মির ছোঁয়া পায়নি, পৃথিবীর হিমেল হাওয়া স্পর্শ করেনি তার দেহ, একটি ফুলের মত পবিত্র সে।

কত কি ভাবছে আর এগুচ্ছে বনহুর। গহন জঙ্গল, চারদিকে হিংস্র জন্তুর গর্জন, বনহুর পকেট হাতড়ে তার ক্ষুদে রিভলভারখানা বের করে নিলো।

হঠাৎ ঠিক তার পাশে অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেলো বনহুর। ফিরে তাকাতেই নজরে পড়লো দুটো জ্বলজ্বলে চোখ। তীব্র আলোর মত দেখাচ্ছে, বনহুর তার রিভলভার উদ্যত করে ধরলো। কিন্তু তার রিভলভার থেকে গুলী নির্গত হবার পূর্বেই বিরাটকায় একটা সিংহ ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপরে।

পড়ে গেলো বনহুর।

বনহুরের হাতের রিভলভারখানা ছিটকে পড়লো দূরে। আচমকা এমনভাবে পড়ে যাওয়ায় বনহুর ভীষণ বিপদে পড়লো। ধস্তাধস্তি করছে নিজকে ওর কবল থেকে রক্ষা করার জন্য। পা যে একটি গর্ত ছিলো জানতো না বনহুর বা পশুরাজ। হঠাৎ পশুরাজ সেই গর্তে পড়ে গেলো।

ভাবতে পারেনি বনহুর এত সহজে পশুরাজের হাত থেকে নিস্তার পাবে সে। বনহুর যখন পশুরাজের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছিলো তখন পশুরাজ হঠাৎ পড়ে যায় গর্তটার মধ্যে। নির্জন পর্বতের পাদমূলে এমন একটা গর্ত কি ভাবে সৃষ্টি হয়েছিলো জানে না বনহুর। উপস্থিত বিপদ থেকে এভাবে উদ্ধার পেয়ে দয়াময়ের নিকট শুকরিয়া জানায় সে। তারাভরা আকাশের অল্প আলোতে বনহুর দেখলো গর্তটা ঠিক তার পাশেই ছিলো ভাগ্যিস সে ঐ গর্তে পড়ে যায় নি, নইলে আবার তাকে বন্দী হতে হত, কারণ গর্তটা ভীষণ গভীর বলে মনে হলো। গর্তটা থেকে চট করে ওঠার কোনো উপায় নেই।

বনহুর শরীরের কয়েক স্থানে বেদনা অনুভব করলো। পশুরা জের থাবা তার দেহের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষত সৃষ্টি করেছিলো। রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছিলো বনহুরের জামাটা। বনহুর অন্ধকারে আবার চলতে শুরু করলো। এখন সে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, তবু মুক্তির আনন্দে মন তার উচ্ছল। পশুরাজ ভাগ্যক্রমে খাদে পড়ে না গেলে তার হয়তো এ মুক্তির আস্বাদ আর গ্রহণ করা হতো না।

বনহুর আর না এগিয়ে একটি গাছের ওপর আশ্রয় নিলো। রাত্রিটুকু যেমন করে হোক তার কাটাতে হবে। ভোরের প্রতীক্ষা করতে লাগলো বনহুর।

এক সময় পূর্বদিক ফর্সা হয়ে এলো।

যদিও বনহুরের দুচোখ নিদ্রায় মুদে আসছিলো তবুও সে ঘুমায়নি। ঘুমালে তাকে গাছ থেকে নিচে মাটিতে আছড়ে পড়তে হবে এবং হাত-পায়ে আঘাত লাগা বিচিত্র নয়। পশুরাজ তার দেহটাকে ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত করে দিয়েছিলো। অত্যন্ত শক্তিশালী বলে বনহুর এ যাত্রা জীবনে রক্ষা পেলো।

পূর্বাকাশে সূর্য উদয় হবার পর বনহুর আর বিলম্ব না করে নেমে পড়লো। শরীরের ক্ষতস্থানগুলো ব্যথায় টনটন্ করছিলো। তবু আবার চলতে শুরু করলো

সে।

পর্বতের পাদমূলে নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটি সরুপথ নজরে পড়লো তার। পথটি অত্যন্ত ক্ষীণ, এ পথে মানুষ চলাচল করে না জীবজন্তু চলে ঠিক বোঝা গেলো না।

বনহুর ঐ পথ ধরে চলতে লাগলো, দেখা যাক ভাগ্য তাকে কোথায় নিয়ে যায়। ঝোঁপঝাড়ের পাশ কেটে এগিয়ে চলেছে পথটা। ক্রমেই পথটা আরও স্পষ্ট লাগছে। হঠাৎ বনহুর দেখলো ঐ পথে দুজন লোক এগিয়ে আসছে, তাদের কাঁধে কিছু আছে বলে মনে হলো।

বনহুর তাকিয়ে রইলো।

লোক দুজন ক্রমান্বয়ে এগুচ্ছে।

বনহুরের মনে প্রশ্ন জাগলো এরা কারা এবং এদের উদ্দেশ্য কি? ওদের কাঁধেই বা কি আছে? তবে যতখানি মনে হয় তাতে বোঝা যায় ওরা স্বাভাবিক মানুষ।

বনহুর একটা ঝোঁপের আড়ালে আত্মগোপন করে লক্ষ্য করতে লাগলো। ওরা আরও নিকটে এগিয়ে এসেছে। এবার বনহুর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ওদের কাঁধে একটি বাক্স, কতকটা শবাধারের মত। তবে কি ওরা ঐ শবাধারে কোনো লাশ বহন করে আনছে।

নিশ্চুপ দেখতে লাগলো বনহুর।

ওরা একেবারে সামনাসামনি এসে পড়েছে।

বনহুর যা ভেবেছিলো তাই।

দুজন জোয়ান পুরুষ একটি শবাধার বহন করে আনছে। ওরা কিছুটা অগ্রসর হয়ে একটু থামলো, তারপর কাধ পাল্টে নিয়ে আবার চলতে লাগলো।

বনহুর আড়ালে আত্মগোপন করে ঐ জোয়ান লোক দুজনকে অনুসরণ করলো, যারা শবাধারটি বহন করে নিয়ে চলেছিলো। ওর মধ্যে কার মৃতদেহ

আছে এবং কেনই বা তারা এভাবে গোপনে চলেছে। এ পথটি শুধু তাদেরই চলাচল পথ কিনা কে জানে।

অত্যন্ত সতর্কভাবে বেশ কিছুটা চলার পর বনহুর দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলো, সে দেখতে পেলো ওরা একটা নির্জন স্থানে মস্ত বড় একটি টিলার পাশে দাঁড়িয়ে শবাধার কাঁধ হতে নামিয়ে ফেললো।

এবার শবাধারের ঢাকনা খুলে ফেললো ওরা দুজন। শৰাধারের ঢাকনা খুলে বের করে আনলো একটি মৃতদেহ। মৃতদেহটা সাদা কাপড়ে জড়ানো।

শবাধার বহনকারী দুজন লাশটা মাটিতে শুইয়ে রেখে শবাধারটি সরিয়ে রাখলো কিছুটা দূরে।

একজন পাথরখণ্ড বা টিলাটার পাশে এসে কোনো বস্তুতে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে টিলাটা একপাশে কাৎ হয়ে গেলো, এবার লাশটা ওরা দুজন তুলে নিয়ে পাথরখণ্ডটার তলায় শুইয়ে দিলো। তারপর আবার পাথরখণ্ডটার গায়ে যে বস্তুটায় চাপ দিতেই পাথরখন্ড বা টিলাটা কাৎ হয়ে পড়েছিলো সেই বস্তুটিতে পুনরায় চাপ দিলো। এবার টিলা বা পাথরখন্ডটি পূর্বের ন্যায় ঠিক স্থানে বসে গেলো।

ওরা দুজন নিশ্চিন্ত মনে শবাধারটি তুলে নিলো কাঁধে, তারপর যে পথে এসেছিলো সেই পথে ফিরে চললো।

লোক দুজন বেশ কিছুদুরে এগিয়ে যেতেই বনহুর সেই পাথরখটার পাশে এসে দাঁড়ালো। একটু তীক্ষ্ণভাবে নজর করতেই দেখতে পেলো বিরাট আকার পাথরখন্ডটার একপাশে একটি অন্য রঙের পাথরের টুকরা বসানো রয়েছে। বনহুর ঐ পাথরের টুকরাটার ওপরে চাপ দিলো, সংগে সংগে একপাশে কাৎ হয়ে পড়লো পাথরখন্ড বা টিলাটি।

বনহুর দেখলো সাদা কাপড়ে জড়ানো একটি মৃতদেহ। দ্রুত হস্তে বনহুর খুলে ফেললো মৃতদেহের মুখমন্ডলে জড়ানো সাদা কাপড়খানা। চমকে উঠলো ভীষণভাবে, একটি তরুণের লাশ। তরুণটির গলায় ক্ষতচিহ্ন।

পাথরখানা সরে যাওয়ার সংগে সংগে উৎকট একটা গন্ধ নাকে লাগছিলো বনহুরের। ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখলো স্তূপাকার করে রাখা হয়েছে।

কতকগুলো পচে গলে যায়নি, সাদা কাপড়গুলো পচা মাংসের রক্তে কেমন যেন ঘোলাটে রং ধারণ করেছে। বনহুর এ রহস্যের কোনো সমাধান খুঁজে পেলো না বরং তার মনে ভীষণ একটা কৌতূহল জাগলো, এভাবে হত্যা করে এখানে পাথরচাপা দেবার কারণ কি? বনহুর ঐ পাথরের ছোট্ট টুকরাটার ওপরে চাপ দিলো, সংগে সংগে পূর্বের ন্যায় পাথরখন্ডটা ঠিক স্থানে এসে বসে গেলো।

বনহুর তাকালো লোক দুজনের দিকে। ওরা কফিন বহন করে এগিয়ে যাচ্ছে। অনেক দূরে চলে গেছে ওরা। বনহুর দূর থেকে ওদের অনুসরণ করলো।

ওরা চলছিলো মন্থরগতিতে, কাজেই বনহুর দ্রুতপদে চলে কিছুক্ষণের মধ্যে ওদের কাছাকাছি এসে পড়লো। তবে সে অত্যন্ত সতর্কতার সংগে ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলো যেন ওরা তাকে দেখে না ফেলে। কি কারণে এভাবে এরা হত্যাকান্ড সংঘটিত করে চলেছে জানতে চায়, বনহুর। আরও জানতে চায় সে এই নির্মম হত্যার পেছনে কি কারণ আছে।

লোক দুজন বনবাদাড় পেরিয়ে এক সময় একটি বিরাট আকার পোড়োবাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলো। এমন নির্জন স্থানে পোড় বাড়িটা, সত্যি বিস্ময়কর বটে!

লোক দুটি প্রবেশ করার পর বনহুর অতি সন্তর্পণে সেই পোডড়াবাড়িটির মধ্যে প্রবেশ করলো। বিরাট বিরাট দেয়ালগুলো ধসে পড়ে তার ওপর বট এবং অশ্বথ বৃক্ষ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বট ও অশ্বথ বৃক্ষ ছাড়াও আরও জানা–অজানা গাছ–গাছড়ার অন্ত নেই। বনহুর এসব গাছ–গাছড়ার আড়ালে আত্মগোপন করে সেই বিস্ময়কর পোড়াবাড়িখানার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো।

কিছুটা অগ্রসর হতেই তার কানে এলো একটা আর্তচিৎকার। সে থমকে দাঁড়ালো, এই নির্জন বনভূমিতে এ চিৎকার কারও কানে পৌঁছবে না। কেউ শুনতে পাবে না, কাজেই কেউ আসার সম্ভাবনা নেই।

নির্জন পোড়োবাড়ির অভ্যন্তরে চলেছে কোনো গোপন রহস্য, যে রহস্যের শিকারে পরিণত হচ্ছে কোনো না কোনো মানুষ। কি সে রহস্য? ……বনহুর সেই আর্ত চিল্কারের শব্দ লক্ষ্য করে এগুতে লাগলো।

আর্তনাদ কোনদিক থেকে আসছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ক্রমেই আর্ত চিৎকার গোঙ্গানিতে পরিণত হলো। বনহুর বুঝতে পারলো কাউকে হত্যা করা হলো। আর্ত

চিৎকার থেমে গেছে, গোঙ্গানির শব্দটাও আর শোনা যাচ্ছে না। স্বর যেন কেমন নীরব থমথমে হয়ে এলো।

বনহুর কোন দিকে এগুবে ভাবছে।

এমন সময় কথাবার্তার অস্পষ্ট শব্দ ভেসে এলো বনহুরের কানে। এবার বনহুর একটি অশ্বখ বৃক্ষের শিকড় ধরে ঝুলে পড়লো, তারপর একটি নতুন স্থানে এসে পড়লো।

একটি ভগ্ন মন্দিরের স্তূপ এবং সেই ভগ্ন মন্দিরের মধ্য হতেই কথাবার্তার শব্দ ভেসে আসছে। বনহুর শুনতে পেলো ভারী কণ্ঠের আওয়াজ–লাশটা ঠিকভাবে রেখেছে তো?

অপর একটি কণ্ঠস্বর–হাঁ, আমরা ঠিকভাবে লাশটা ঠিক স্থানে রেখেছি।

এবার এই লাশটা তুলে নাও কফিনে। এই কণ্ঠস্বর সেই ভারী কণ্ঠ।

বনহুর বুঝতে পারলো কোনো হত্যাকান্ড সমাধা হয়েছে, সেই হত্যাযজ্ঞের বলিদানকে শবাধারে ওঠানোর নির্দেশ দেয়া হলো।

একটি ফাটলের পাশে এসে দাঁড়ালো বনহুর।

ফাটলের মধ্য দিয়ে উঁকি দিতেই দেখতে পেলো, তিনজন ব্যক্তি পাশাপাশি তিনটি হাতল ছাড়া চেয়ারে বসে আছে। সামনে একটি লম্বা টেবিলে শায়িত একটি লোক। লোকটি প্রাণহীন তা বেশ বোঝা গেলো।

যে লোক দুজন শবাধারটি বহন করে আনলো তারা দাঁড়িয়ে আছে, তাদের পাশে শবাধারটি রয়েছে।

ভেতরে বেশ অন্ধকার, লালচে একটি আলোকরশি ভগ্ন মন্দিরের ভিতরটা আলোকিত করে রেখেছিলো। লোক দুজন এবার লাশটাকে তুলে শবাধারে রাখলো। বনহুর গভীর মনোযোগ সহকারে দেখছে।

লাশটি শবাধারে তুলে নেবার পূর্বে সাদা চাদরে জড়িয়ে নিলো ভাল করে। এত দ্রুত ওরা কাজ করছে, বনহুর অবাক হলো দেখে।

ওরা কফিন বা শবাধারটি কাঁধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে যেতেই তিনজন যারা বসেছিলো তাদের একজন একটি কলিংবেল টিপলো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই একজন তরুণকে চোখ বাঁধা অবস্থায় দুজন লোক নিয়ে এলো। তারা এবার তরুণটির চোখের বাধন খুলে দিলো!

বনহুর দেখলো তরুণটির বয়স বিশ–বাইশ হবে। সে কোনো সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বলিষ্ঠ সুঠাম চেহারা। চোখ দুটিতে করুণ অসহায় চাউনি। বললো তরুণটি–আপনারা আমাকে এখানে কেন এনেছেন?

তিন ব্যক্তির মধ্য একজন জবাব দিলোতোমাকেই শুধু আনা হয়নি তোমার মত আরও বহু তরুণকে বন্দী করে আনা হয়েছে। তোমাদের সবাইকে আমাদের প্রয়োজন আছে।

কি প্রয়োজন জানতে পারি কি? বললো তরুণটি। একজন বললো–পারো এবং একটু পরই আরও ভাল করে জানবে।

আপনারা আমাকে হত্যা করবেন?

হত্যা না করলে তোমার হৃৎপিন্ড পাবো কি করে? বললো প্রথম ব্যক্তি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো–ওর প্রশ্নের জবাব দেয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

তৃতীয় ব্যক্তি বললো–মৃত্যুর পূর্বে ওর ইচ্ছাটা পূর্ণ করা শ্রেয়। কারণ ও আর জানার সুযোগ পাবে না।

তাহলে তুমিই বল যদি তোমার বাক্যব্যয় করতে দ্বিধা না থাকে। কথাটা বললো প্রথম ব্যক্তি।

তরুণের মুখমন্ডল ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে ব্যথাকাতর করুণ কণ্ঠে বললো–আপনারা যা চাইবেন আমার পিতামাতা তাই দেবেন। তবু আমাকে আপনারা হত্যা করবেন না।

অট্টহাসি হেসে উঠলো প্রথম ব্যক্তি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো– তোমার পরিবর্তে তোমার বাবা মা কি তাদের হৃৎপিন্ড দেবেন? যদি দেন তাহলে তোমাকে আমরা ফেরত দেবো।

তরুণ বললো–হৃৎপিন্ড নিয়ে আপনারা কি করবেন? শুনেছি রক্ত বিক্রি হয়। বিদেশে রক্তের দাম আছে.......।

শুধু রক্ত নয়, এখন আমরা হার্ট মানে হৃৎপিন্ডু বিদেশে চালান দিচ্ছি। তোমাদের মৃত্যু হলেও আসলে তোমাদের শুধু দেহ বদল হবে, মৃত্যু হবে না। কারণ তোমরা বেঁচে থাকবে আর একজন ব্যক্তির মধ্যে। বলে থামলো দ্বিতীয় ব্যক্তি।

প্রথম ব্যক্তি বললো–অমন অবাক হয়ে কি শুনছো বাছা! সত্যি সত্যি তোমরা মরবে না, বেঁচে থাকবে অপর একজনের দেহের মধ্যে।

তরুণ বললো–আমি কোনোদিন শুনিনি হৃৎপিন্ড বিদেশে যায়। আমি জানি না সে হৃৎপিন্ড সঠিকভাবে আর একজনকে জীবিত রাখতে সক্ষম হয় কিনা?

এত জানার দরকার নেই। শুধু শুনে রাখো, তোমার মত আরও শত শত তরুণ তাদের হৃৎপিন্ড দান করে এক একটি মহা ব্যক্তিদের জীবন রক্ষা করে চলেছে। তাদের এ দান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এমন একটি মেশিন আমাদের আছে যে মেশিনের ক্ষমতা অপরিসীম। তোমার দেহে আমরা কোনো অস্ত্রোপচার করবো না, শুধু ঐ মেশিনটার নিচে টেবিলখানার ওপরে শোবে, মেশিনটা নেমে আসবে ধীরে ধীরে তোমার বুকের ওপর। মেশিনটা নেমে আসবে তারপর তুমি টেরও পাবে না কত সহজে তোমার হৃৎপিন্ড বুকের পাজর ভেদ করে ঐ মেশিনের গহ্বরে হৃৎপিন্ড রক্ষণাবেক্ষণের থলেতে গিয়ে পৌঁছবে। একটু থেমে বললো লোকটা–হৃৎপিন্ডগুলো এই অদ্ভুত মেশিনের গহ্বরে রক্ষণাবেক্ষণ থলেতে জমা হয়ে রয়েছে। কোনো হাতের স্পর্শ ঐ হৃৎপিন্ডগুলো পায়নি। এগুলো আমরা রক্ষণাবেক্ষণ থলেসহ পাঠাবো এমন এক দেশে যেখানে এর এক একটি হৃৎপিন্ডের বিনিময়ে পাবো কোটি কোটি টাকা......লোকটা অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলো।

তরুণের মুখমন্ডল ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। তার ঠোঁট দুখানা একটু নড়ে উঠলো কিন্তু কোনো কথা বের হলো না। অসহায়ভাবে টেবিলের পাশে অদ্ভুত মেশিনটার দিকে তাকালো।

লোকটা দন্ডায়মান লোক দুটিকে ইংগিত করলো তরুণটিকে টেবিলটার ওপরে শুইয়ে দিতে। শুইয়ে দেয়ার পূর্বে একটা ইঞ্জেকশন পুশ করলো তরুণটার দেহে।

সংগে সংগে আর্তনাদ করে উঠলো তরুণটি।

সেকি তীব্র আর্তনাদ।

বনহুর লক্ষ্য করে শিউরে উঠলো।

তরুণটাকে এবার টেবিলে শুইয়ে দেয়া হলো। তরুণটা এখনও আর্তনাদ করছিলো। ওকে শুইয়ে দেয়ার সংগে সংগে প্রথম ব্যক্তি পাশের সুইচে হাত রাখলো। মেশিনটা এবার অতি ধীরে ধীরে টেবিলের দিকে নেমে আসছে।

বনহুর মুহূর্তে বিলম্ব না করে মন্দিরের জানালা দিয়ে লাফিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো এবং প্রচন্ড এক ধাক্কায় সরিয়ে দিলো ঐ ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি বিস্ময়কর মেশিনটার সুইচ টিপে ধরেছিলো।

ধাক্কা খেয়ে লোকটা পড়ে গেলো আসন থেকে। বনহুর পা দিয়ে প্রচন্ড এক লাথি মারলো যেন সে চট করে উঠে দাঁড়াতে না পারে। পাশে যে দুজন বসেছিলো এবার তাদের আক্রমণ করলো বনহুর ভীষণভাবে।

ওরা আচমকা এই আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলো না। বনহুর আক্রমণ করার সংগে সংগে ওরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো প্রথমে, তারপর শুরু হলো তিনজনের সংগে বনহুরের মল্লযুদ্ধ।

যে দুজন তরুণটিকে নিয়ে এসে টেবিলে শুইয়ে দিয়েছিলো, তারা পালাতে যাচ্ছিলো, বনহুরের প্রচন্ড ঘুষিতে তারাও ধরাশায়ী হলো।

হঠাৎ এই দৃশ্য তরুণটিকে অবাক করে দিয়েছে। সে কিছু ভাবতে পারছে না। তাড়াতাড়ি টেবিল থেকে উঠে মেঝের একপাশে দাঁড়ালো।

যে ব্যক্তি অদ্ভুত মেশিনটার সুইচ টিপে ধরেছিলো তাকেই বনহুর প্রথম আঘাত করে এবং সে কারণে মেশিনটা সশব্দে স্বস্থানে ফিরে গিয়েছিলো। তরুণটার দেহ স্পর্শ করার সুযোগ হয়নি মেশিনটার।

বনহুর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের কাহিল করে ফেললো এবং এক একজনকে হত্যা করলো। পাশের একটি রড় তুলে নিয়ে প্রথম ব্যক্তির মাথায় আঘাত করলো ভীষণভাবে। সেও মৃত্যুবরণ করলো। এবার যারা বাকি ছিলো তারা প্রাণভয়ে পালালো।

বনহুর সেই রড দিয়ে বিস্ময়কর মেশিনটার ওপরে আঘাত করলো। বারকয়েক আঘাত পেয়ে মেশিনটা একপাশে কাৎ হয়ে ভেঙে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে লালচে আলোটা দপ করে নিভে গেলো।

অন্ধকারে আচ্ছন্ন হলো ভগ্নমন্দিরটি।

বনহুর তরুণটির পাশে এসে দাঁড়ালো। এখনও তার হাতে পূর্বের সেই রডখানা রয়েছে। তরুণটির অবস্থা শোচনীয়, সে মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা পেলেও সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত নয়। বনহুর যখন রডসহ তরুণটির পাশে গিয়ে দাঁড়ালো তখন ভীতভাবে তাকালো সে বনহুরের মুখের দিকে।

তরুণটির পাশে দাঁড়িয়ে বনহুর ওর কাঁধে হাত রাখলো, বললো–আপাততঃ তুমি নিশ্চিন্তু থাকতে পারো যুবক। এসো আমার সঙ্গে......বনহুর ওর হাত ধরে নিয়ে চলালো।

মন্দিরটির বাহির অংশ ভগ্নপ আকার ধারণ করলেও ভিতরে অত্যাধুনিক উপায়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ তথা এয়ার কন্ডিশনের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো এবং নানা ধরনের বিস্ময়কর মেশিন বসানো ছিলো। বনহুর লক্ষ্য করেছিলো তরুণটিকে কোন পথে মন্দিরটার ভেতরে আনা হলো। ঐদিকে একটি দরজা আছে তাতে কোনো ভুল নেই। বনহুর তরুণসহ সেই পথে অগ্রসর হলো। মন্দির থেকে বাইরে বের হতেই দেখতে পেলো একটি সুড়ংগপথ।

বনহুর সেই পথে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলো তরুণ বাধা দিয়ে বললো–আপনি ঐ সুড়ংগে প্রবেশ করবেন না। ওর মধ্যে আছে একজন ভয়ংকর লোক। যে আমাদের ধরে এনেছে শহরতলী অঞ্চল থেকে।

থমকে দাঁড়িয়ে বললো বনহুর–ভয়ংকর লোক আছে ওর মধ্যে?

হাঁ, তার দেহে ভীষণ শক্তি। সে একা দশজন মানুষকে কাবু করতে পারে। সেই তো আমাদের ধরে এনেছে।

তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না যুবক, তুমি ভালভাবে বুঝিয়ে বলল

জানি না আপনি কে। আপনাকে দেখে আমার বড় শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা করছে। শুনুন ঐ সুড়ংগপথ এমন এক কক্ষে প্রবেশ করেছে যে কক্ষে আমার মত আরও দশজন তরুণ বন্দী আছে এবং তাদের সবাইকে পাহারা দিচ্ছে ঐ বলিষ্ঠ জোয়ান লোক। তার শরীরে অসুরের শক্তি। তাকে দেখলে আপনিও ভড়কে যাবেন......

আর বলতে হবে না, এসো তুমি আমার সংগে।

না, আমাকে ওরা আবার আটক করবে।

ভাগ্যে যা আছে হবে, এখানে তোমাকে একা রেখে যেতে পারি না, তাতে তোমার নতুন কোনো বিপদ আসতে পারে। এসো আর বিলম্ব করো না। আমি দেখতে চাই। আচ্ছা, আরও যে দশজন তরুণকে ওরা আটক করে রেখেছে, তারা কারা?

তারা আমার সংগী, একই সংগে কলেজে লেখাপড়া করি।

হঠাৎ একই সংগে এদের কবলে কিভাবে পড়লে? বললো বনহুর।

তরুণ বললো–আমরা কলেজ থেকে পিকনিকে এসেছিলাম। নতুন এক জায়গা বেছে নিয়েছিলাম আমরা কিন্তু সে জায়গা আমাদের জীবনকে এভাবে বিপন্ন করবে তা ভাবতে পারিনি। একজন বলিষ্ঠ লোক এসে আমাদের সবাইকে এমনভাবে বেঁধে ফেললো আমরা কেউ শক্তি খাঁটিয়েও তাকে কাহিল করতে পারলাম না। অবশ্য আমাদের যখন সে আটক করে তখন তার সাহায্যকারী ছিলো আরও কয়েকজন।

বেশ, এর বেশি এ মুহূর্তে আমি জানতে চাই না। পরে সব শুনবো। এসো আমার সংগে..

বনহুর তরুণটিসহ সুড়ঙ্গপথে নিচে নেমে গেলো। কিছুটা এগুতেই বনহুর বাধা পেলে, অস্ত্রধারী একটা লোক আক্রমণ করলো বনহুরকে।

প্রস্তুত ছিলো বনহুর, হস্তস্থিত রডখানা দিয়ে আক্রমণকারী কাঁধে আঘাত করতেই ধরাশায়ী হলো সে। তার হাতের সূতীক্ষ্ণধার ছোরাখানা পড়ে গেলো

ছিটকে।

মুহূর্ত বিলম্ব না করে ছোরাটা তুলে নিলো বনহুর এবং দ্রুত তরুণসহ অগ্রসর হলো। রড়খানা তরুণের হাতে দিয়ে বললো–রাখো প্রয়োজন হতে পারে।

বনহুর আর তরুণ সুড়ংগপথ ধরে এগিয়ে চলেছে। কিছুদূর এগিয়ে যেতেই সেই ভীষণকায় বলিষ্ঠ জোয়ান লোকটার ওপর নজর পড়লো।

লোকটা বসে বসে নেশা করছিলো নিশ্চিন্ত মনে। তার পাশে রাইফেল দেয়ালে ঠেশ দিয়ে রাখা আছে।

বনহুর তরুণটির দিকে তাকালো।

তরুণ বললো–আমাদের সবাইকে ঐ সামনের একটা কক্ষে আটক করে রেখেছিলো। আমাদের মধ্যে দুজনকে ওরা হত্যা করেছে, একথা জেনেছি ওদেরই মুখে। আমাকে ওরা হত্যা করতে নিয়ে গিয়েছিলো, আপনি যদি ঠিক সময়মত না পৌঁছতেন তাহলে আমার বুক চিরে বের করে নিতে হৃৎপিন্ডটা। উ! কি মর্মান্তিক মৃত্যুই না ঘটতো আমার।

যাক, ও সব কথা। এবার তুমি সাবধানে এখানে দাঁড়াও। রড়খানা মজবুত করে ধরে রাখো, যদি কেউ আক্রমণ করে ওটা দিয়ে নিজকে রক্ষা করো……

তরুণ বনহুরের কথায় মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো এবং সেই স্থানে দাঁড়িয়ে রইলো।

বনহুর এগিয়ে গেলো দ্রুত এবং সেই জোয়ান বলিষ্ঠ লোকটির বুকে ছোরাখানা চেপে ধরে বললো–খবরদার, একচুলও নড়বে না।

বলিষ্ঠ লোকটা প্রথমে হকচকিয়ে গেলেও পরক্ষণেই সজাগ হয়ে উঠলো এবং আক্রমণ করলো বনহুরকে। সে ছোরাটাকে গ্রাহ্য করলো না।

বনহুরকে দুহাতে চেপে ধরলো লোকটা।

ওর কাছে বনহুরকে একটা শিশুর মত দেখাচ্ছিলো। ওর দেহটা ছিলো একটি ছোটখাটো গরিলার মত। বিকট মুখমন্ডল, কান দুটো ছোট, নাকটা চ্যাপ্টা। ওর

চেহারা দেখলে সত্যিই ভয় পাবার কথা। বনহুর ভয় পেলো না, সে তার হস্তস্থিত ছোরাখানা সমূলে বসিয়ে দিলো ওর বুকে, এ ছাড়া কোনো উপায়ও ছিলো না। এমন জোরে চাপ দিচ্ছিলো লোকটা বনহুরকে যে, বনহুরের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো, তার পাজরের হাড়গুলো যেন ভেঙে যাওয়ার উপক্রম।

বনহুর ছোরাখানা বসিয়ে দিয়ে আবার টেনে তুলে নিলো। লোকটা একটা তীব্র আর্তনাদ করে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে ছুটে এলো আরও কয়েকজন। তাদের মধ্যে বনহুর দেখলো সেই মন্দির হতে পালিয়ে যাওয়া দুজনকে।

বনহুরের রাগ এবার চরমে উঠলো।

এরা হৃৎপিন্ডের ব্যবসা করছে অসহায় তরুণদের জীবননাশ করে। না, ক্ষমা এদের করা যাবে না, বনহুর তার হস্তস্থিত ছোরা এক একজনের বুকে বসিয়ে টেনে তুলে নিচ্ছিলো। কাউকে পালাবার সুযোগ বনহুর দিলো না। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে বনহুর পথরোধ করে এক কটিকে খতম করে চললো।

একজন দ্রুত ছুটে গিয়ে প্রবেশ করলো ওদিকের একটি সুড়ংগমধ্যে।

বনহুর তাকে অনুসরণ করলো এবং সেও সেই অন্ধকার সুড়ংগে প্রবেশ করলো বিস্ময়ে হতবাক হলো বনহুর ক্ষণিকের জন্য, একটা আবছা অন্ধকার কক্ষে প্রায় তেরো চৌদ্দ জন তরুণকে হাত-পা বেঁধে রাখা হয়েছে। লোকটি এই সব তরুণের মধ্যে গা ঢাকা দিলো। লুকিয়ে পড়লো সে তরুণদের ভীড়ে।

বনহুরের দৃষ্টি এড়ালো না, সে লোকটাকে টেনে বের করে আনলো তরুণদের ভীড়ের মধ্য হতে এবং কঠিন কণ্ঠে বললো–নরাধম, জানো না একদিন পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। আজ তোমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হলো। দাও এই তরুণদের হাত-পা মুক্ত করে দাও।

বনহুর যেমন কঠিনভাবে কথাগুলো উচ্চারণ করলে তাতে লোকটা পারলো না নিশ্চুপ থাকতে, সে ভীত দৃষ্টি নিয়ে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে। একটু পূর্বে সে নিজের চোখে দেখেছে কি নির্মমভাবে বনহুর অন্যদের হত্যা করেছে। কাজেই ভীত হবার কথা বটে।

লোকটা ওপাশের দেয়ালের একটা খুপড়ি থেকে একথোকা চাবি বের করে এক একটি তরুণের হাত এবং পায়ের তালা খুলে দিলো।

বন্দী তরুণদল মুক্ত হলো। তারা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে। তারা ভাবতেও পারেনি এভাবে কেউ এসে তাদের মুক্ত করতে পারে। তরুণদল নিজেদের জীবনের আশা–ভরসা একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলো, কারণ এমন জায়গায় তাদের বন্দী করে রাখা হয়েছিলো যেখানে কোনোদিন কেউ তাদের সন্ধান পাবে না এবং উদ্ধার করতেও আসবে না। মা–বাবা ভাই–বোন সবাইকে হারিয়েছে তারা। এসেছিলো মনের আনন্দে পিকনিক করবে বলে, বেছে নিয়েছিলো নতুন এক জায়গা, নির্জন বনাঞ্চল। কিন্তু কে জানতো তাদের চারপাশ রহস্যজালে ঘেরা ছিলো। কৌশলে তাদের আটক করে আনা হলো, তারপর অন্ধকার গহ্বরে বন্দী করে রাখা হলো, এক একজন করে হত্যা করা হচ্ছে প্রতিদিন। শুধু তারা নয়, এমনি কত তরুণের জীবন নাশ করে হৃৎপিন্ড সংগ্রহ করা হয়েছে তার হিসেব নেই। বনহুরকে তারা দেবদূত মনে করে এই মুহূর্তে, যে তাদের মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করলো আকস্মিকভাবে। তরুণদল মুক্ত হবার পর তাদের চোখেমুখে ফুটে উঠলো কৃতজ্ঞতার ছাপ।

তরুণদের বন্ধন মুক্ত হবার পর বনহুর সেই ব্যক্তিকে ধরে ফেললো এবং কঠিন কণ্ঠে বললো–তুমি ভেবেছে তোমাকে ক্ষমা করবো? যতগুলো জীবন তুমি নাশ করেছে তার প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে গ্রহণ করতেই হবে। বনহুর এবার লোকটার হাত-পা–মুখ মজবুত করে বেঁধে ফেললো, তারপর বললো–তোমাকে ছোরাবিদ্ধ করে এত সহজে হত্যা করবো না। এভাবে তোমাকে এই অন্ধকার গহ্বরে তিল তিল করে শুকিয়ে মরতে হবে।

বনহুর তরুণদের লক্ষ্য করে বললো–সবাই এই পথে বেরিয়ে যাও, আমিও আসছি।

তরুণদলটা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলো সুড়ংগপথ ধরে।

বনহুরও বেরিয়ে এলে তাদের পেছনে।

এবার বনহুর তরুণদল সহ সুড়ংগ মুখখানা মজবুতভাবে বন্ধ করে দিলো, যেন সে কোনোমতে বেরিয়ে আসতে না পারে।

বনহুর তরুণদের নিয়ে শহরে ফিরে এলো।

তরুণগণ যে যার গৃহে প্রত্যাবর্তন করলো। আনন্দে ভরে উঠলো তাদের পিতামাতা আত্মীয়স্বজনের মন। মৃত্যুগহ্বর থেকে সন্তানগণ ফিরে এসেছে–এটা কম কথা নয়।

তরুণদের পিতামাতা আত্মীয়স্বজন বনহুরকে অভিনন্দন জানালেন আন্তরিকভাবে। তারা নানা উপঢৌকন দিতে গেলে কিন্তু বনহুর তার একটিও গ্রহণ করলো না।

বনহুর যে শহরে তরুণদের পৌঁছে দিলো শহরটির নাম সিনহাদেউড়। অন্যান্য যে কোনো সাধারণ শহরের সঙ্গে তুলনা করা যায়। শহরটা বেশ বড়। বনহুর এই নতুন শহরে নতুনভাবে নতুন দৃষ্টি নিয়ে সব দেখতে লাগলো।

শহরে যানবাহনের অভাব নেই। জনসংখ্যা অন্যান্য দেশের মত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কলকারখানা আর মেশিনপত্র সবকিছু রয়েছে। শ্রমিকরা কাজ করছে, ব্যবসায়িগণ ব্যবসা করছে, সব চলছে নিয়মিতভাবে। সিনহা দেউড। ভালই লাগছে বনহুরের কাছে।

এক স্থানে ভীড় দেখে থমকে দাঁড়ালো বনহুর।

লোকজন গোলাকার হয়ে কিছু দেখছে।

বনহুর ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেলো।

দেখলো একটা বৃদ্ধের রক্তাক্ত দেহের ওপরে মাথা ঠুকে বিলাপ করছে এক বৃদ্ধা। বৃদ্ধার শরীরে মাংসের চিহ্ন নেই, ক্ষীণ এবং দুর্বল কণ্ঠে বিলাপ করছিলো। পরনে তার শত তালিযুক্ত কাপড়।

বনহুর একজনকে জিজ্ঞাসা করলো–ব্যাপার কি ভাই?

লোকটা বললো–তুমি কোথা থেকে এসেছে যে জানো না? ঐ বৃদ্ধা রাজার আদেশ পালন করেনি, তাই তার স্বামীকে হত্যা করেছে রাজার অনুচরগণ কশাঘাতে জর্জরিত করে।

বনহুর অবাক হয়ে বললো– কি এমন আদেশ যা পালন করেনি বলে বৃদ্ধকে হত্যা করা হলো?

আমরা কেউ কিছু বলতে পারবো না। সবাই যে যার পথে চলে গেলো।

বনহুর এবার এগিয়ে গেলো বৃদ্ধার পাশে, দেখলো বৃদ্ধটার সমস্ত শরীর রক্তাক্ত, কোনো শক্ত বস্তুর আঘাতে তার প্রাণবায়ু বের হয়ে গেছে।

বনহুর বৃদ্ধার মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললো–মা, তোমার স্বামীকে এমনভাবে কারা হত্যা করেছে বলবে আমাকে?

বৃদ্ধা আঁচলে চোখ মুছে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে। হয়তো বা বনহুরের মুখে একটা সান্তনার আভাস খুঁজে পেলো, বললো সে–আমার একমাত্র ছেলে, তার ভীষণ অসুখ, রাজার হুকুম তাকে কাজে যেতে হবে। অসুখ থাকায় যেতে পারেনি বলে ওর বাবাকে ডেকে পাঠিয়েছিলো, তারপর এই অবস্থা……আবার কাঁদতে শুরু করলো বৃদ্ধা।

বনহুর বললো–কে সে রাজা?

কারখানার মালিক!

কারখানা! কিসের কারখানা?

ঐ তো কাঠের কারখানা।

ওখানে তোমার ছেলে কাজ করতো?

হাঁ, বড় গরিব আমরা। ওর বাবা বুড়া মানুষ, কোনো কাজ এখন করতে পারে না, তাই আমার ছেলে কাজ করে। ওর খুব অসুখ তাই কাজে যেতে পারেনি……

বনহুর একবার ভাল করে তাকিয়ে দূরে কারখানাটা দেখে নিলো। তারপর বললো–চলো বুড়ীমা, কেঁদে আর কোনো ফল হবে না।

বনহুর বৃদ্ধাকে হাত ধরে টেনে তুলে নিয়ে তার কুঁড়েঘরের দিকে এগুলো।

কুঁড়েঘরে ছেঁড়া–ময়লা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে বেহুশ হয়ে পড়ে আছে বৃদ্ধার তরুণ ছেলেটা। বৃদ্ধা এবার সংজ্ঞাহীন সন্তানের বুকের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে বিলাপ করে কাঁদতে লাগলো–বাবা একবার হুশ করে দেখ তোর বাবাকে ওরা মেরে ফেলেছে। একবার হুশ করে দেখু……

কিন্তু সন্তান সংজ্ঞাহীন, মায়ের আর্তনাদ তার কানে প্রবেশ করলো না।

এ দৃশ্য বনহুরকে বিচলিত করলো।

কোনো সান্ত্বনা সে দিতে পারলো না ঐ মুহূর্তে। কি যেন ভাবলো বনহুর মনোযোগ সহকারে, তারপর ওদিকের ঝোলা না দড়ির ওপরে রাখা একটি চাদর ছিলো, ওটা টেনে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলো।

*

সিনহাদেউড়ের নাম করা ধনবান ব্যবসায়ী মিঃ আলী নসর। তার কাঠের কারখানায় শত শত শ্রমিক কাজ করে। হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে সারাটা দিন পর পায় সামান্য কিছু পয়সা, যা দিয়ে একজনের কোনো রকমে চলে বা চলতে পারে। মাঝে মাঝে শ্রমিকগণ ক্ষেপে ওঠে তখন তারা কাজ বন্ধ করে দেয় কিন্তু আলী নসর তার লোক পাঠিয়ে জোর করে ধরে নিয়ে যান এবং বেত্রাঘাতে জর্জরিত করেন তাদের দেহ। কোনো প্রতিবাদ তাদের চলে না, কারণ দেশের নেতৃস্থানীয় লোক হলেন এই আলী নসর। অসহায় শ্রমিক, মজুর এরাকার কাছে নালিশ দেবে। যারা বিচার করবেন তারাই হলেন আলী নসরের হাতের মুঠোয়।

মিঃ আলী নসর সিনহাদেউড়ের সরকারের লোক। পদাধিকার বলে তার আধিপত্য সর্বস্থানে। সিনহা প্রশাসন বিভাগ তার ব্যাপারে নীরব। কাজেই যে কোনো শ্রমিক অথবা কোনো নিরীহ

জনগণের প্রতি যদি কোনো অন্যায় অবিচার তিনি করেন তাতে কারও বলবার কিছু নেই।

বনহুর সবকিছু জেনে নিলো গোপনভাবে। এমন নির্দয় ব্যক্তিগণ সাধুতার মুখোশ পরে চরম এক অবস্থা সৃষ্টি করেছে দেশে যে, সাধারণ জনগণ কেউ বুঝতেই পারে না, আর পারলেও তাদের বলার কোনো সুযোগ নেই। বললেই তাদের ওপর চলবে ষ্টিম রোলার।

বনহুর নিজে শ্রমিকের বেশ ধারণ করে সমস্ত সিনহাদেউড় ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো। সন্ধ্যার পরে ফিরে আসে সে ঐ বৃদ্ধার কুটিরে।

ভেবেছিলো বনহুর, তরুণদের নিজ নিজ আবাসস্থলে পৌঁছে দিয়ে কান্দাইয়ের পথে রওনা দেবে কিন্তু তা হলো না। তাকে আবার নতুন এক বেড়াজাল ঘিরে ফেলেছে, সেই বেড়াজাল ছিন্ন করে তবেই তো সে মুক্তি পাবে। বনহুর গোটা পৃথিবীটাকে নিজের দেশ মনে করে। সমস্ত বিশ্ববাসী তার আপনজন। সবার মঙ্গল তার কামনা। এ পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান যাযাবরের মত। কেউ চিরদিনের জন্য এ পৃথিবীতে বাঁচতে আসেনি। দুদিনের খেলাঘরে মানুষ এসেছে খেলা করতে। খেলা সাঙ্গ হলে চলে যাবে যে যার গন্তব্যস্থানে। এ পৃথিবীর কোনো বন্ধন তখন কাউকে ধরে রাখতে সক্ষম হবে না। এ দুনিয়ায় যারা সৎ কাজ করবে তারা তার পুরস্কার পাবে এবং যারা মন্দ কাজ করবে তারা তার জন্য চরম শাস্তি পাবে। এই নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু মানুষ এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করতে এসে ভুলে গেছে সব কথা। ভুলে গেছে একদিন অভিনয় শেষ হবে, শূন্যমঞ্চ পড়ে থাকবে। পৃথিবীর কোনো বস্তুই সেদিন সংগে যাবে না। রাজা মহারাজা যারা নেতৃস্থানীয় সুউচ্চ আসনে উপবিষ্ট তাদেরকেও সম্পূর্ণ শূন্যহস্তে বিদায় নিতে হবে। এ পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ বড় কঠিন স্থান, একটি উঁচ পরিমাণ বস্তুও নিয়ে যাওয়ার অধিকার সেদিন থাকবে না।

বনহুর পথ চলছিলো আর ভাবছিলো নিজের জীবনের কথা। তার পাশ কেটে চলেছে অবিরাম গতিকে কর্মব্যস্ত জনগণ। সবাই যন্ত্রচালিত মেশিনের মত ছুটছে অবিরাম গতিতে। কেউ কারও দিকে ফিরে তাকাবার সময় নেই। কারও জন্য কারও এতটুকু ভাববার সময় নেই। পথের ধারে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একটি মানুষ–কেন তার এমন অবস্থা, কেন সে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ফুটপাতের ধারে, এটুকু জানার জন্য কারও মনে কোনো প্রশ্ন জাগছে না। কেউ বা একটু ফিরে তাকিয়ে দেখলো, হয়তো বা হৃদয়ে একটুখানি ব্যথার উদ্রেক হলো কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। আবার পথ চলছে, ভুলে গেলো ঐ মুহূর্তে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা লোকটার কথা।

এক সময় মরে গেলো লোকটা।

ওর শরীরটা ফুটপাতের ধারে পড়ে রইলো উচ্ছিষ্ট আবর্জনার মত। হা করা মুখে মাছি প্রবেশ করছে। দু একটা কাক এসে বসছে তার আশেপাশে, এখনও শরীরটার পচন ধরেনি।

পরদিন আবর্জনার সঙ্গে তুলে নেয়া হলো ওর দেহটা তারপর ফেলে দিয়ে আসা হলো শহরের বাইরে যেখানে শহরের মানুষগুলো যায় না কোনো সময়। শিয়াল শকুন কুকুর আর কাক শরীরটা টেনে–ছিড়ে খাবে। একদিন নিঃশেষ হয়ে গেলো পৃথিবীর বুক থেকে সে। কেউ জানল না, কেউ ভেবে দেখলো না মুখ থুবড়ে থাকা লোকটা গেলো কোথায়।

এ পৃথিবীর বাস্তব রূপ বড় কঠিন আর নির্মম। এখানে বাঁচতে হলে সংগ্রাম করে বাঁচতে হবে। যারা সৎপথে, ন্যায়ভাবে বাঁচতে চায় তারা মহৎ ব্যক্তি এবং তাদের বেঁচে থাকা কঠিন হলেও তার মধ্যে আছে পরিপূর্ণ আত্মতৃপ্তি। যারা অসৎ উপায়ে, অন্যায়ভাবে ঐশ্বর্য আর অর্থ উপার্জন করে মহানন্দে দিন যাপন করে, তারা কোনোদিনই সুখী নয়, তারা এ পৃথিবীর কল্পনার রঙিন স্বপ্নে বিভোর। পৃথিবীটা তাদের চোখে বড় সুন্দর মনোরম। তারা ভাবে চিরদিন আমরা এমনি করে বেঁচে থাকব, কোনো পরিবর্তন আসবে না আমাদের জীবনে। আমাদের মৃত্যু হবে না, আমরা চির অমর হয়ে পৃথিবীর রূপ–রস উপভোগ করবো। এরা বড় অধম, এদের জন্য সত্যি মায়া হয়। পৃথিবীর মোহজালে এরা আবদ্ধ কিন্তু সেই চরম দিন যখন আসবে তখন তারা চোখে গোলক ধাঁধা দেখবে, সর্ষে ফুলের সমারোহ ভাসবে চোখের সামনে....

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো বনহুর, বৃদ্ধার সন্তানটির ভীষণ অসুখ, তার চিকিৎসার প্রয়োজন। সম্মুখে একটা ওষুধের দোকান দেখে উঠে পড়লো, যা চিন্তা করছিলো তার থেকে কিছুক্ষণের জন্য পরিত্রাণ পেলো সে।

ডাক্তার পর্দার আড়ালে বসেছিলেন, কোনো রোগী দেখছিলেন তিনি।

বনহুর ডাক্তারের অপেক্ষায় দাঁড়ানো।

রোগী বেরিয়ে এলে বনহুর ভেতরে প্রবেশ করলো। বনহুরের শরীরে শ্রমিকের ড্রেস। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি–গোঁফ। গায়ে বৃদ্ধ শ্রমিকটার ময়লা চাদর।

প্রথমে ভেতরে প্রবেশে বাধা দিচ্ছিলো একজন লোক। হয়তো সে দোকানের কর্মচারী। বনহুর বললো–আমার যেতেই হবে ডাক্তারের কাছে, কারণ আমার রোগী ভীষণ অসুস্থ।

কোনো বাধা সে মানলো না, ডাক্তারের কাছে পৌঁছে গেলো বনহুর। ডাক্তার চশমার ফাঁকে তাকালেন বনহুরের দিকে।

বনহুর সালাম দিয়ে বললো–ডাক্তার সাহেব, আপনাকে যেতে হবে আমার সঙ্গে।

অবজ্ঞার সঙ্গে বললো ডাক্তার–জানো আমার ফি কত?

জানি না।

সামনে সাইন বোর্ডে লেখা আছে।

লেখাপড়া জানি না, পড়ে দেখবো কি করে।

তবে বেরিয়ে যাও।

না, আপনাকে যেতেই হবে।

পারবে আমার ফি দিতে?

আপনি ডাক্তার, শুধু ফি নেয়াই কি আপনার কর্তব্য? রোগীর প্রতি কি আপনার কোনো কর্তব্য নেই?

এত কথা শুনতে চাই না, ফি দিতে পারলে আমাকে ডেকো, তা ছাড়া তোমার রোগী মরে গেলেও আমি যাবো না।

আচ্ছা চলুন, ফি দেবো।

পরে কিন্তু কোনো কাকুতি মিনতি শুনবো না।

বেশ চলুন।

ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধার কুটিরে এলো বনহুর।

বনহুর বললো–রোগীকে ভাল করে দেখুন এবং তার যেভাবে চিকিৎসা দরকার করুন।

ডাক্তার রোগী দেখলেন এবং বললেন–এ রোগীর কঠিন অসুখ। অনেক টাকা-পয়সা লাগবে।

যা লাগবে দেবো, আপনি চিকিৎসা করুন।

চিকিৎসা শুরু করবার পূর্বে ফি দিতে হবে……

নইলে?

চিকিৎসা হবে না। ডাক্তার ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

বনহুর সেই মুহূর্তে বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরলো ডাক্তারের গলার কাছে জামাসহ টাইটা। দাঁতে দাঁত পিষে বললো বনহুর–ডাক্তার টাকার মোহ তোমার ছুটিয়ে দেবো। হাজার হাজার টাকা রোগীদের কাছ থেকে লুটে নিচ্ছো, একটা রোগীর কাছ থেকে টাকা না নিলে কি তোমার চলবে না?

কে তুমি!

আমি একজন শ্রমিক। প্রাণের ভয় আমরা করি না। এই মুহূর্তে আপনাকে হত্যা করে আমি জেলে যেতে পারি। ওদিকের টেবিল থেকে একটা হাতুড়ি তুলে নিলো বনহুর হাতে–খবরদার, চিৎকার করবেন না বা কাউকে ডাকবেন না।

তাহলে তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও?

যদি না যান তাহলে একটা উপায় আমাকে করতেই হবে। চলুন, টাকা আপনি পাবেন কিন্তু রোগী সেরে ওঠার পর।

ডাক্তার বললো–রোগী সারবে; টাকা তোমাকে দিতে হবে, কিন্তু ডবল টাকা নেবো।

তাই দেবো চলুন।

বনহুর ডাক্তারসহ বেরিয়ে এলো।

বৃদ্ধার সন্তানের চিকিৎসার প্রয়োজন আর হলো না, ডাক্তারসহ এসে দেখলো বনহুর বৃদ্ধা আছড়ে পড়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে বিলাপ করছে।

বনহুর আর ডাক্তার হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

বৃদ্ধা বনহুরকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লো–আমার সোনামনি ওর বাবার কাছে চলে গেছে। ওর আর ডাক্তার দরকার হবে না বাপ, ওর আর চিকিৎসা লাগবে না......

বনহুরের গন্ড বেয়ে দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। পৃথিবীর এই নির্মম পরিহাস তার হৃদয়কে বিচলিত করলো। গরিব অসহায় যারা তারা এমনি করেই মরে। তাদের জন্য নেই কোন ব্যবস্থা, রোগ–শোক, জরা ব্যাধি সব যেন তাদের জন্য। তাদের জন্য নেই কোনো সুযোগ–সুবিধা। যাদের অর্থ আছে, আছে ঐশ্বর্যবান আত্মীয় স্বজন তারাই পায় চাকরী, তাদের জন্য আছে সকল সুখ সুবিধা। আর যাদের অর্থ নেই, নেই কোনো স্বনামধন্য মামা, তারা পথে পথে ধুকে ধুকে অকালে জীবন হারাচ্ছে। তাদের কোনো প্রতিভার দাম নেই, রোগে–শোকে সান্তনা দেবার কেউ নেই। শুধু লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা পাওয়ার জন্যই যেন তাদের জন্য।

বনহুর হঠাৎ বজ্রমুষ্ঠিতে চেপে ধরলো ডাক্তারের জামার কলার। দাঁতে দাঁত পিষে বললো–দেখলেন ডাক্তার সাহেব? চোখের সামনে দেখছেন এত কিছু তবু আপনাদের চক্ষু খোলে না। এত পাষন্ড আপনারা! যান চলে যান, আপনাদের মত ডাক্তার যারা অর্থ ছাড়া কিছু বোঝে না তারা কসাই.......যান যদি জ্ঞানলাভ করেন সত্য মানুষ হতে চেষ্টা করবেন।

বনহুর ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো ডাক্তারকে।

মুখ কালো হয়ে উঠলো ডাক্তারের। তার ললাটে ফুটে উঠলো চিন্তারেখা। এমন অবস্থায় ডাক্তার কোনোদিন পড়েননি। অনুশোচনায় মুষড়ে পড়লেন ডাক্তার, তিনি বনহুরের হাত দুখানা চেপে ধরে বললেন–মাফ করো ভাই, আমার দিব্যদৃষ্টি খুলে গেছে, আমি আমার অসৎ আচরণের জন্য অনুতপ্ত। আর কোনো দিন আমি অর্থের লোভ করবো না। তোমাকে স্পর্শ করে শপথ করছি......।

বেশ, তাই করবেন–যান।

না, আমি যাবো না। যতক্ষণ না এই মৃতদেহের সকাজ সমাধা হয়েছে ততক্ষণ আমি থাকবো এখানে এবং এই মৃতদেহের সকাজ করতে যে অর্থ ব্যয় হয় সে অর্থ আমি দেবো। শ্রমিক হলেও ওরা মানুষ।

ডাক্তারের কথার শব্দগুলো বনহুরকে বিমোহিত করলো। বললো বনহুর– ধন্যবাদ আপনার দিব্যদৃষ্টি এত সহজে খুলে গেলো বলে।

ডাক্তার নিজের পকেট থেকে একতাড়া নোট বের করে বৃদ্ধার হাতে গুঁজে দিলেন।

*

গভীর রাত।

সিনহাদেউড়ের রাজপথ নিস্তব্ধ।

হঠাৎ মাঝেমধ্যে দুএকটি যানবাহন নিস্তব্ধ পথকে আলোড়িত করে চলে যাচ্ছিলো।

মিঃ আলী নসরের বাড়ির সম্মুখে এসে থামলো একটি কালো রঙের গাড়ি। রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে গাড়িখানা যেন মিশে গেছে।

শয়নকক্ষে পায়চারী করছিলো মিঃ আলী নসর। বার বার দোতলার জানালাপথে নিচে লক্ষ্য করছিলো।

গাড়িখানা এসে থামতেই আলী নসর বাড়ির পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন। গাড়িখানা সামনের গেটে দাঁড়িয়ে পেছন ফটকে এসে থেমেছিলো। সামনের গেটে রয়েছে সিকিউরিটি প্রহরী, কারণ আলী নসর একজন মন্ত্রীবাহাদুর। তাঁর বাসভবনে কড়া পাহারারত রয়েছে পুলিশবাহিনী। আরও আছে ভয়ংকর হিংস্র বুল ডগ, কুকুরগুলোকে দিনে অন্ধকার ঘরে বন্দী করে রাখা হয় এবং রাতের বেলায় তাদের গলা থেকে খুলে নেয়া হয় শিকল। তখন তারা ভয়ংকর হয়ে ওঠে, কিন্তু প্রভুকে তারা কিছু বলে না। রাতের অন্ধকারে পেছন সিঁড়ি দিয়ে মনিব যখন নেমে যায় নিশাচরের মত তখন তারা লেজ নেড়ে অভিবাদন জানায়। ওগুলোকে রাখা হয়েছে নিরাপত্তার জন্য। যেন কোনো সাধারণ মানুষ চত্বরে প্রবেশ করতে না পারে।

মিঃ আলী নসর গাড়িতে গিয়ে বসলেন।

গাড়ি চলতে শুরু করলো।

বিরাট কারখানা।

সার্চ লাইটগুলো দানবের চোখের মত দপ দপ করে জ্বলছে। কারখানার মেশিনগুলো এখন নীরব।

কারখানার দারোয়ান ফটক খুলে দিলো।

শীতের কন কনে হাওয়ায় পাহারাদার বেশ করে কম্বলটা জড়িয়ে নিয়েছিলো গায়ে, মুখখানা স্পষ্ট নজরে পড়ছিলো না।

ড্রাইভার গাড়িখানাকে কারখানার পেছন অংশে ছোট দরজার পাশে এনে রাখলো। এবার ড্রাইভার নেমে গাড়ির দরজা খুলে ধরলো।

মিঃ আলী নসর নেমে পড়লেন।

দুজন লোক দাঁড়িয়ে ছিলেন তারা মিঃ আলী নসরকে অভিবাদন জানালেন। তাদের শরীরে মূল্যবান ওভারকোট, হাতে গ্লাভস, মাথায় ক্যাপ জাতীয় টুপি।

মিঃ আলী নসর লোক দুটির সঙ্গে কারখানার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।

মিঃ আলী নসরের পেছনে ড্রাইভার এলো, বেশ কিছু দূরত্ব রেখে এগুচ্ছিলো সে।

কারখানার সম্মুখভাগে যান্ত্রিক দানবগুলোর কাজ চলে, উৎপাদন হয় বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বস্তু যা মানুষের কাজে আসে। আর পেছন অংশে গোপন স্থানে গুদাম ভর্তি রয়েছে বেবী ফুড়। যে সব শিশুখাদ্য গুদামজাত করে রাখা হয়েছে তাতে মেশানো হচ্ছে নানা ধরনের ভেজাল এবং তা। গোপনে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে। ব্যবসায়িগণ রাতের অন্ধকারে এসব মালমাল নিয়ে যায়–আসে কোটি কোটি টাকা।

অন্যান্য দিনের মত আজও মিঃ আলী নসর কয়েক ট্রাক মাল তুলে দিলেন ব্যবসায়ীদের হাতে, তারপর টাকার বান্ডিল সহ এটাচ ব্যাগটা গ্রহণ করলেন।

এর পর বিদায়ের পালা।

মিঃ আলী নসর তার অনুগত কর্মচারীদের ওপর সমস্ত দায়িত্বভার প্রদান করে টাকাভর্তি ব্যাগসহ গাড়িতে উঠে বসলেন।

দুচোখে তাঁর রঙিন স্বপ্নের নেশা। মনের হৃষ্টতার সঙ্গে পুষ্ট হয়ে উঠেছে দেহটা। ভুড়িটা নিয়ে নড়াচড়া ভার তবুও নড়াচড়া করতে হয়, নইলে রোগ বাড়বে।

মিঃ আলী নসর শুধু স্বনামধন্য ব্যক্তিই নন, তার গগনচুম্বী অর্থের পাহাড়, ঐশ্বর্য তাঁর চৌদ্দপুরুষকে নিশ্চিন্ত রাখবে। নামে বেনামে কত বাড়ি গাড়ি ইমারত তার হিসেব নেই কোনো। রাতের বেলা চলে অর্থ উপার্জন আর দিনের আলোতে তাকে বিচরণ করে ফিরতে হয় শহর হতে শহরে, গ্রাম হতে গ্রামান্তরের জনগণের মধ্যে তাকে বক্তৃতা করতে হয় বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে। মাঝে মধ্যে গেলাসের ঠান্ডা পানি পান করে কণ্ঠ পরিষ্কার করে নিতে হয়। জনদরদী মিঃ আলী নসর অবিগলিত গলায় যখন বক্তৃতা করেন তখন জনগণের চোখেও পানি না এসে পারে না। আলী সাহেব নিজেও রুমালে চোখ মোছেন। নামাজের গভীর চিহ্ন তার ললাটে, মুখে দাড়ি, চোখে মমতাভরা চাউনি।

এহেন আলী সাহেব গাড়িতে বসে কল্পনার রঙিন স্বপ্নের জাল বুনে চলেন। হোক না অসৎ উপায়ে উপার্জিত অর্থ তবুও তো তিনি নামাজ পড়েন, প্রতি ওয়াক্তে তিনি দুহাত তুলে আল্লাহর দরগায় তওবা করেন, কাজেই অসৎ হলেও তা হক হয়ে যায় মনে করেন আলী সাহেব।

গাড়িতে বসে এসব কথাই ভাবছিলেন আলী সাহেব। তিনি তো একা এসব করছেন না, তার মত যারাই আজ গদিতে বসে আছেন তারা সবাই নিজ নিজ আখের গুছিয়ে নিচ্ছেন। তারা যদি অর্থের স্তূপ গড়ে নিতে পারেন তাতে আবার দোষ কিসে। এমন সুযোগ জীবনে কবার আসে। অনেক সাধনার পর এ গদি লাভ, সেই গদিতে বসে যদি কিছু করতেই না পারেন তাহলে যে জীবনটাই বৃথা। ছেলে–মেয়েরা যেন জনসমাজে হেয় না হয়, তারা যেন কোন ছোট কাজে নিয়োজিত না হয়, এসব কারণেই তো এত প্রচেষ্টা। দেশ উচ্ছনে গেলে তাদের কি যায় আসে। মরবে তো ঐ বেচারারা যারা সমাজের আবর্জনা……মিঃ আলী নসরের মনটা ঘৃণায় ভরে ওঠে, ঐসব জীর্ণশীর্ণ মানুষগুলো যখন তার চোখের সামনে এসে পড়ে তখন ইচ্ছা হয় চোখ বন্ধ করে নিতে। গাড়ির পাশে এসে হাত পাতার সুযোগ যদিও ওরা পায় না, কারণ সঙ্গে থাকে সিকিউরিটি পুলিশ { যারা তাদের দেহরক্ষীর কাজ করে তারা সজাগভাবে হটিয়ে দেয় ওদের। তবু ওরা দূর

থেকে লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে, যদি কাছে আসতে পারতো তাহলে হয়তো লাভ হতো–কিছু পেতো, মুখে অন্ন উঠতো।

হায় নির্বোধ দুঃস্থ মানুষ। তোমরা জানো না ওরা কতখানি হৃদয়হীন, নরপশু বললেও বুঝি ভুল হবে না। নরপতি ওরা, স্বনামধন্য ব্যক্তি ওরা, ওরাই যে বিচারক এবং ভাগ্যনিয়ন্তা। মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে ওরা ভালবাসে।

এই স্বনামধন্য ব্যক্তিদেরই একজন হলেন মিঃ আলী নসর।

কল্পনার রঙিন স্বপ্নে বিভোর ছিলেন আলী নসর। তার পাশে টাকা ভর্তি ব্যাগ। মনের আবেশে চোখ দুটো মুদে ছিলেন তিনি।

গাড়িখানা হঠাৎ থেমে পড়লো।

চমকে উঠলেন মিঃ আলী নসর, সোজা হয়ে বসে তিনি তাকালেন গাড়ির বাইরে। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন–এটা তো রাজপথ নয়, এ তুমি কোথায় আনলে ড্রাইভার।

ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে দরজা খুলে ধরে বলে–নেমে আসুন আলী সাহেব।

তুমি...তুমি কে? গাড়িতে বসেই আলী নসর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন গাড়ির দরজার পাশে দাঁড়ানো ড্রাইভারের দিকে।

ড্রাইভার টেনে নিচে নামিয়ে নেয় মিঃ আলী নসরকে। তাঁর পাঁজরে একটি সূতীক্ষ্ণধার ছোরা চেপে ধরে বলে–চিৎকার করবেন না, কারণ আশেপাশে কেউ আপনাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসার পূর্বেই আপনার পাজর ভেদ করে এই ছোরাখানা শুষে নেবে আপনার তাজা রক্ত। কাজেই......নিশ্চুপ থাকুন।

তুমি ড্রাইভার শাহী ফিরোজ নও?

না

তবে কে তুমি?

আমি বনহুর।

বনহুর। তুমি দস্যু বনহুর?

হাঁ

তুমি জানো আমি কে?

জানি, তুমি একজন নরপশু, জানোয়ার।

কি বললে? আমার মুখের ওপর এমন কথা বলতে সাহস হলো তোমার?

স্বনামধন্য ব্যক্তিদের পদসেবা করে যারা তাদের দলে আমি নই। আমি জানতে চাই, কেন তুমি বা তোমরা দেশের নেতা সেজে দুঃস্থ অসহায় মানুষের রক্ত শোষণ করছে তার জবাব দিতে

কি বললে?

তোমাদের মুখোশ আমি উন্মোচন করে দেবো। দেশের ও দশের মঙ্গলার্থী বেশে তোমরা ডাকাতের চেয়েও বড়.....এই নির্জন প্রান্তরে তোমার কথা কেউ শুনতে পাবে না বা কেউ এগিয়ে আসবে না। সঠিক জবাব আজ আমি তোমার কাছে চাই। বলল, শ্রমিক বশির কি করেছিলো যার জন্য তাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছো?

না, আমি তাকে হত্যা করিনি, তার অবাধ্যতার জন্য তাকে শাস্তি দেয়া হয়েছিলো। সেই শাস্তি সে সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুবরণ করেছে।

সব আমি শুনেছি। আমি সব জেনে তারপর ঠিকস্থানে হাজির হয়েছি, সব সন্ধান নেয়া আমার শেষ হয়েছে। দেশের নেতৃস্থানীয় পদে আসীন হয়ে অসহায় জনগণের হাড় ভেঙে যাচ্ছে কিন্তু কত দিন খাবে, সবকিছুরই শেষ আছে।

তোমাকে আমি উপযুক্ত শাস্তি দেবো। তুমি আমাকে অপমান করছে। আমার নাম–পদ সব তোমার জানা থাকা সত্ত্বেও তুমি......

বনহুর অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো–তারপর কঠিন কণ্ঠে বললো–জানো তুমি এখন কোথায়? শহর ছেড়ে অনেক দূরে এক জলাশয়ের পাশে। গভীর জলাশয়। এই হিম শীতের রাতে তোমাকে ঐ জলাশয় সাঁতার কেটে পার হতে হবে। যদি

ওপারে পৌঁছতে পারো তবে জীবনে রক্ষা পেলে আর যদি সাঁতারে বিফল হও তবে তোমার এই সাধের বিশাল বপু তলিয়ে যাবে জলাশয়ের গভীরে।

এসব তুমি কি বলছো?

হ্যাঁ। যা সত্য তা বলছি,

তুমি আমার নাম জানো না?

একই কথার পুনরাবৃত্তি করছে মন্ত্রী বাহাদুর। তুমি যত বড় পদাধিকারীই হও না কেন, এ মুহূর্তে তুমি শিশুর চেয়েও অসহায়, কারণ তোমার সিকিউরিটি এখন তোমার দেহরক্ষী হিসেবে নেই। তোমার বুল ডগ এখন তোমার কাছে নেই। আছে শুধু তোমার কর্মফলের বিশাল বপুটা, যা তোমাকে শুধু ভারীই করবে, হাল্কা হবে না তুমি।

আমাকে তুমি হত্যা করতে চাও?

স্বাভাবিক হত্যা নয়, তোমাকে জলাশয়ে নিক্ষেপ করে তোমার ওজন দেখবো, ভেসে থাকো ডুবে যাও।

মুখমন্ডল মরার মুখের মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। আবছা অন্ধকারে ড্রাইভারের মুখখানা দেখবার চেষ্টা করলেন মিঃ আলী নসর। এতক্ষণে যেন তার হুশ হলো, এ মুহূর্তে তার পদাধিকার বলের দৌরাত্ম্য কোনো কাজেই আসবে না বেশ অনুধাবন করলেন তিনি। নিরাপত্তা বাহিনী দিনের বেলায় তার সংগে থাকে কিন্তু রাতের বেলায় তিনি নিরাপত্তা বাহিনী ছাড়াই বিচরণ করে বেড়ান, এহেন অবস্থায় মিঃ আলী নসর চোখে গোলক ধাঁধা দেখেন।

বনহুর বললো–ভেবেছো তোমরা চিরকাল গদিতে বসে ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়াবে, গড়ে তুলবে ঐশ্বর্যের ইমারত। সুযোগ বুঝে পাড়ি জমাবে বিদেশে। কিন্তু তোমরা কেন ভুলে যাও জনগণের দৃষ্টি এড়িয়ে বিদেশে পাড়ি জমালেও রেহাই পাবে না ঐ একজনের কাছে, যিনি সর্বশক্তিমান সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক……সেদিন তোমাদের পদমর্যদা, ধনদৌলত, ঐশ্বর্যের ইমারত কিছুই কাজে আসবে না, পারবে না কেউ তোমাকে রক্ষা করতে। লোক দেখানো পুণ্য করে কি লাভ তোমাদের? স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আত্মীয়-স্বজন যাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তোমরা অসহায় জনগণের মুখের গ্রাস শোষণ করে স্বনামধন্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে

তার প্রতিফল ধরা আছে, সেদিন জবাব দিতে হবে। মনে মনে ভাবছে, পরকাল বলে কিছু আছে নাকি। নরাধম, জানো না পরকাল না থাকলে আজ তোমাদের পাপের উপযুক্ত বিচার হতো না। তোমরা দেখতেই পাচ্ছো যে যেমন কাজ করছে সে তার তেমনি ফল পাচ্ছে। ভাল কাজ করলে তার ফলাফল ভাল। আর মন্দ কাজ করলে তার জন্য আছে উপযুক্ত শাস্তি……এবার বনহুর মিঃ আলী নসরের জামার কলার ধরে টেনে নিয়ে চললো অদূরে জলাশয়ের পাশে।

ভীত আতঙ্কিত আলী নসরের কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেছে। তিনি ঢোক গিলে বললেন– আমার কাছে যা চাইবে তাই দেব। যত টাকা আমার সঙ্গে আছে সব তুমি নাও তবু আমাকে জলাশয়ে নিক্ষেপ করো না। আমি মোটেই সাঁতার জানি না……।

সাঁতার জানো না তবে উপায় কোথায়। যদি সাঁতার জানতে তাহলে উদ্ধার পেতে। ডাকো তাদের যারা তোমার অসৎ উপায়ে উপার্জিত অর্থে সুখ ভোগ করে চলেছে, তোমার স্ত্রী পুত্র–কন্যা এবং আরও যারা তোমার প্রাসাদে ভোগ–বিলাসে আত্মবিভোর–তোমার চিৎকার শুনে যদি কেউ এগিয়ে আসে। কেউ আসবে না মহাতুন, আজ কেউ আসবে না। শুধু তোমার কর্মফল পাশে রয়েছে……

তবু তোমার দয়া হবে না?

আমি একজন দস্যু ডাকু, আমার আবার দয়া। যেদিন তুমি বৃদ্ধ শ্রমিকটিকে হত্যা করেছিলে নির্মম কশাঘাতে, সেদিন সেও তোমার মত বাঁচতে চেয়েছিলো। সেদিন তার মনেও সাধ জেগেছিলো স্ত্রী পুত্রকে একনজর দেখবার। কিন্তু সে সাধ কি তুমি পূর্ণ হতে দিয়েছিলে নেতা? শুধু জনগণের রক্তই শোষণ করোনি, করেছে শত শত লক্ষ লক্ষ শিশুদের প্রাণনাশ। শিশুখাদ্যে ভেজাল মিশিয়ে গোপনে কোটি কোটি টাকা লুটে নিয়েছে। সামনে রেখেছে জনহিতকর কল কারখানা উৎপাদনমুখী মুখোশ, আর তার পেছনে চলেছে দেশ আর জনগণকে ধ্বংস করার মেশিন। তোমার শাস্তি মৃত্যুদন্ড নয়, তারও বেশি যদি কিছু থাকে তাই।

ক্ষমা করো, সব বিলিয়ে দেবো। তবু প্রাণে মেরো না আমাকে।

বড় সাধের শরীর। মাখন আর ফলের রসে টসটসে দেহটা, সত্যি আমারও খুব মায়া হচ্ছে এই মাখন আর ফলের রসের পয়সাগুলো যদি বস্তির ঐ লোকগুলো পেতো তাহলে ওরা অনেকগুলো প্রাণ পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকার অধিকার পেতো। কত বড় হৃদয়হীন তোমরা, তোমাদের প্রাসাদের পাশে ডাষ্টবিনগুলোতে

যখন কংকালসার ছেলেরা ছেঁড়া বস্তা কাঁধে ময়লা হাতড়ায় তখন কি তোমারের মনে একটুও মায়া হয় না যে, ওরাও মানুষ। তোমাদের সন্তানরা যখন টেবিলে রাশিকৃত খাবারের সামনে বসে খাবো না ক্ষুধা নেই বলে তখন কি তোমাদের মনে, পড়ে সেই জীর্ণশীর্ণ কচি মুখগুলো, যারা দিনান্তে একমুঠি খাবার পায় না। যাক, তোমাকে এসব বলা বৃথা, কারণ তুমি সাঁতার জানোনা।

বনহুর কথা শেষ করেই প্রচন্ড এক ধাক্কা দিয়ে মিঃ আলী নসরের নাদুস নুদুস দেহটা ফেলে দেয় জলাশয়ের মধ্যে।

ঝুপ করে একটা শব্দ হলো, তারপর গোঙ্গানির আওয়াজ ভেসে এলো জলাশয় থেকে।

বনহুর কান পেতে শুনলো, তারপর ফিরে এলো গাড়ির পাশে।

*

সিনহাদেউডের সবচেয়ে বড় হোটেল শাহী এলুনা। এ হোটেলে সর্বক্ষণ স্বনামধন্য ব্যক্তিদের আনাগোনা। দেশী–বিদেশী মূল্যবান ঝকঝকে গাড়ির মিছিল হোটেল শাহী এলুনার সম্মুখে পার্ক করা থাকে।

একুশ তলাবিশিষ্ট শাহী এলুনার অভ্যন্তরে চলে নানা ধরনের আমোদ প্রমোদ।

আলোর ঝলকানিতে চোখে ধাঁধা লাগে সন্ধ্যার পর। রাত যত বাড়তে থাকে ততই হোটেল শাহী এলুনার সামনে গাড়ির ভীড় জমতে থাকে।

বিভিন্ন ক্যাবিন থেকে ভেসে আসে মনোমুগ্ধকর মিউজিকের শব্দ, যা সবাইকে করে তোলে উচ্ছল আনন্দমুখর।

লিফটে আনাগোনা চলে তবে শ্বেতপাথরে তৈরি সিঁড়িও আছে ব্রোঞ্জে বাঁধানো ধারগুলো বৈদ্যুতিক আলোতে ঝলমল করে। চোখ জুড়ানো আলোর ঝাড় হীরা–মতির মত আলো বিচ্ছুরিত করতে থাকে।

এহেন হোটেল শাহীর একটি ক্যাবিনে বনহুর দুগ্ধফেনিল শয্যায় অর্ধশায়িত অবস্থায় সিনহাদেউড়ের দৈনিক সংবাদপত্রের ওপর চোখ বুলিয়ে চলেছিলো। পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় বৃহৎ আকারে ছাপানো হয়েছে স্বনামধন্য মিঃ আলী

নসরের ছবি। গত কয়েকদিন হলো তিনি নিখোঁজ ছিলেন, গতকাল তার মৃতদেহ সিনহাদেউড়ের শহরতলীর একটি জলাশয় থেকে পাওয়া গেছে। তার শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। কি করে তিনি সেই জলাশয়ের পাশে গেলেন তা জানা যায়নি। সিনহাদেউড়ের পুলিশবাহিনী জোর তদন্ত চালিয়ে চলেছেন। হাসলো বনহুর, আলী নসর....স্বনামধন্য ধনকুবের মন্ত্রী বাহাদুর আলী নসর,... কথাগুলো আপন মনে উচ্চারণ করলো বনহুর। একটা গভীর আত্মতৃপ্তি তার মনটাকে অনেকটা হাল্কা করে দিয়েছে। মিঃ আলী নসরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। এখনও বাকি আছে আরও কিছু ব্যক্তি। যদিও তাদের সম্বন্ধে মূল তথ্য এখনও ভালভাবে এবং সঠিকভাবে জানতে পারেনি সে, তাই হোটেল শাহী এলুনাতে তাকে আশ্রয় নিতে হয়েছে। বনহুর চায় না বিনা দোষে অন্যায়ভাবে কেউ শাস্তি পাক। মিঃ আলী নসরের ব্যাগভর্তি টাকাগুলো এ সময়ে বনহুরের কাজে লাগছে। কিছু অর্থ বনহুর বৃদ্ধার হাতে তুলে দিয়ে এসেছে, বলেছে আবার আসবো। বনহুর যখন বস্তি এলাকায় যায় তখন সে শ্রমিকের বেশে যায় আর যখন হোটেল শাহী এলুনাতে থাকে তখন তাকে একজন বিদেশী বলে মনে হয়। মূল্যবান পোশাক–পরিচ্ছদ এবং তার সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা তাকে হোটেল শাহী এলুনার একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি বলেই পরিচয় দেয়।

বনহুর মিঃ আলী নসরের ছবিখানার ওপর আর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে সংবাদপত্রখানা উল্টিয়ে একপাশে রাখলো।

কিছু ভাবলো বনহুর, তারপর ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালো। ওভার কোটটা পরে নিলো বনহুর, তারপর বেরিয়ে এলো ক্যাবিনের বাইরে।

লিফটের পাশে এসে দাঁড়াতেই লিফটের দরজা খুলে গেলো। বনহুর লিফটে প্রবেশ করলো, লিফট তাকে দোতলায় পৌঁছে দিলো। সোজা বেলকুনি ধরে সে এগিয়ে এলো নিচে নামার সিঁড়ি ঘরের সামনে। ঐ সিঁড়ি দিয়ে বনহুর নিচে নেমে এলো, তারপর নিজের গাড়িতে চেপে বসলো।

বনহুরের গাড়িতে কোনো ড্রাইভার ছিলো না, সে নিজে ড্রাইভ করছিলো। সিনহাদেউড়ের রাজপথ বেয়ে গাড়ি এসে থামলো পুলিশ অফিসের পাশে।

সিনহাদেউড়ের পুলিশ সুপার মিঃ এরোমা লোদী। তিনি ব্যস্তসমস্ত হয়ে সহকারীদের সঙ্গে মিঃ আলী নসরের হত্যাকান্ড নিয়ে আলোচনা করছিলেন। পুলিশমহলই শুধু নয় সমস্ত দেশবাসী এই হত্যাকান্ডের কথা ছড়িয়ে পড়েছে।

বিস্ময়কর এই মৃত্যু। মিঃ আলী নসর নিহত হয়েছেন না আত্মহত্যা করেছেন, এ ব্যাপারে সবার মনে নানা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে। জোর তদন্ত চলছে এই মৃত্যু নিয়ে।

বনহুর গাড়ি থেকে নেমে পুলিশ অফিসে প্রবেশ করলো।

মিঃ এরোমা লোদী উঠে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন। হোটেল এলুনা থেকে বনহুর ফোন করেছিলো পুলিশ সুপারের অফিসে–আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ। সখ করে এ কাজে যোগ দিয়েছি। যদি আপনারা আমার প্রয়োজন মনে করেন তাহলে মিঃ আলী নসরের মৃত্যু ব্যাপারে আমি আপনাদের সহযোগিতা করতে পারি। পুলিশ সুপার মিঃ এরোমা খুশিই হয়েছিলেন ফোন পেয়ে। কারণ পুলিশ মহলই শুধু নয়, সিনহাদেউড় সরকার মহল এ ব্যাপারে ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন এবং চিন্তিত। মিঃ আলী নসর সাধারণ ব্যক্তি নন, তিনি একজন জনদরদী নেতা, স্বনামধন্য ব্যক্তি।

মিঃ আলী নসরের অস্বাভাবিক মৃত্যু দেশব্যাপী এক বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের হৃদয়ে একটু অজানা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। এত কড়া পাহারা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এমন হবার কারণ কি? আলী নসর কখন আঁর বাসভবন ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছিলেন তাও কেউ জানে না।

বাড়ির মেইন গেটে সিকিউরিটি পুলিশ সদাসর্বদা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দন্ডায়মান। তারা কেউ বলতে পারে না মিঃ আলী নসর কখন রাতের অন্ধকারে বাইরে বেরিয়েছিলেন।

মিঃ এরোমা বনহুরের সঙ্গে করমর্দন করার পর আসন গ্রহণ করলেন। বনহুর নিজের পরিচয়পত্র পেশ করলো এবং সেও আসন গ্রহণ করলো।

মিঃ এরোমা বনহুরের ব্যবহারে মুগ্ধ হলেন, তিনি এই মুহূর্তে এমন এক ব্যক্তিকে পাশে পেয়ে নিজকে ধন্য মনে করলেন। বনহুরের সঙ্গে মিঃ নসরের মৃত্যু নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা শুরু করলেন।

মিঃ এরোমা লোদী আর বনহুরের মধ্যে ইংরেজিতে কথাবার্তা চলছিলো কারণ মিঃ এরোমা বিদেশী এবং তার মাতৃভাষা ইংরেজি, কাজেই তাদের কথাবার্তা ইংরেজিতেই চলছিলো।

মিঃ এরোমার দিকে বনহুর তার মূল্যবান সিগারেট কেসটা বের করে ধরলো– গ্রহণ করুন।

মিঃ এরোমা ধন্যবাদ জানিয়ে বনহুরের সিগারেট কেস থেকে একটি সিগারেট তুলে নিলেন।

বনহুর নিজেও একটি সিগারেটে ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরে প্রথমে মিঃ এরোমার সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে নিয়ে তারপর নিজের সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো, একমুখ ধোয়া ছেড়ে তাকালো বনহুর দেয়ালের দিকে।

এ সময় বনহুরকে গভীর চিন্তাযুক্ত মনে হচ্ছিলো।

মিঃ এরোমা লোদী তীক্ষ্ণ নজরে দেখছিলেন বনহুরকে। পৌরুষদীপ্ত বলিষ্ঠ চেহারা, মুখমন্ডল বুদ্ধিদীপ্ত, প্রশস্ত ললাট, গভীর নীল দুটো চোখ।

বনহুর তার পরিচয়পত্রে নাম ব্যবহার করেছে–মিঃ আহসান চৌধুরী।

মিঃ এরোমা লোদী কয়েকমুখ ধোয়া ছেড়ে বললেন–মিঃ আহসান, আপনি মিঃ আলী নসরের মৃত্যু কি আত্মহত্যা বলে মনে করেন?

গভীর মনোযোগ সহকারে বনহুর মিঃ আলী নসরের পোষ্ট মর্টেমের রিপোর্ট দেখছিলো। মিঃ এরোমা লোদীর কথায় চোখ তুলে তাকালো সে। বাঁ হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে সিগারেট থেকে ধূম্রশিখা মৃদুমন্দভরে বেরিয়ে আসছিলো। বনহুর এ্যাসট্রের মধ্যে সিগারেট থেকে ছাই ঝেড়ে নিয়ে বললো–পোষ্টমর্টেম রিপোর্টে যতটুকু বোঝা যাচ্ছে তাতে মনে হয় তিনি আত্মহত্যা করেছেন কিন্তু পুলিশ রিপোর্টে যা জানা গেলো তাতে সন্দেহ জাগছে, তিনি আত্মহত্যা করার কোনো কারণ ঘটেনি বলে মনে হয়। মিঃ এরোমা, মিঃ আলী নসরের মিল–কারখানাগুলো একবার তদন্ত করে দেখা দরকার যদি কোনো সূত্র পাওয়া যায়।

মিঃ এরোমা লোদী বনহুরের কথাটা সমীচীন মনে করলেন। বনহুরসহ তিনি মিঃ আলী নসরের ইন্ডাষ্ট্রি অভিমুখে রওয়ানা দিলেন।

বিরাট ফটক পেরিয়ে মিল কারখানার এরিয়া। মিঃ আলী নসর অত্যন্ত সজাগ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি মিলের চারপাশে সার্চলাইট বসিয়েছেন মিলের মালামাল

রক্ষার্থে সজাগ থাকার কারণে। সন্ধ্যার পূর্বেই সার্চলাইটগুলো দৈত্যরাজের চক্ষুর মত জ্বলে ওঠে। কেউ প্রবেশে সক্ষম নয় সেখানে।

এই মিল-কারখানার প্রবেশদ্বারে যখন পুলিশ সুপারের গাড়ি এসে পৌঁছলো তখন কেউ বাধা দিলো না। মিলের ম্যানেজার এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালেন। যদিও তারা আশ্চর্য হয়েছিলেন হঠাৎ মিলকারখানা পরিদর্শন করার জন্য পুলিশ সুপারের আগমন কেন।

ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে করমর্দন করলেন মিঃ এরোমা লোদী এবং বনহুর। বনহুরের শরীরে আজ শ্রমিকের ড্রেস নয়, মূল্যবান কোর্ট–সার্ট প্যান্ট–টাই, পায়ে ভারী জুতা।

বনহুর শ্রমিকের বেশে এই মিলে এসেছে এবং কাজও করেছে কয়েক দিন। তার উদ্দেশ্য ছিলো গোপনে সব জেনে নেয়া। ম্যানেজার সাহেব তাকে দেখেছেন। সমস্ত দিন কাজের পর যখন পারিশ্রমিক দেয়া হয় তখন ম্যানেজার সাহেব স্বয়ং উপস্থিত থাকতেন, কাজেই বনহুরকে শ্রমিক বেশে তিনি বেশ কয়েকবার দেখছেন তবুও আজ তিনি বনহুরকে মোটেই চিনতে পারলেন না।

এই মিল-কারখানার কোথায় কি আছে সব জেনে নেয়া হয়ে গেছে বনহুরের।

মিঃ এরোমা লোদীর সঙ্গে এই যেন প্রথম এসেছে বনহুর এমনিভাবে অগ্রসর হচ্ছে সে।

মিঃ এরোমা লোদী বললেন–মিঃ আলী নসরের মৃত্যুরহস্য উদঘাটন ব্যাপারে আমাদের জরুরি দরকার হয়ে পড়েছে বিভিন্ন স্থানে তদন্ত চালানো। যদি কোনো সূত্র পাওয়া যায় এ কারণেই আমরা তার মিল-কারখানা পরিদর্শন করতে এসেছি।

বললেন ম্যানেজার মিঃ কাওসার–নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে আমার সহযোগিতা পাবেন।

বললো বনহুর–আমরা খুশি হবো যদি আপনার সাহায্য পাই। চলুন আমরা আলী নসর সাহেবের মিল–কারখানা এবং মিল কারখানা সংলগ্ন গুদামঘরগুলো পরিদর্শন করে দেখি কোনো সূত্র পাওয়া যায় কি না……

মিঃ কাওসার ব্যস্তকণ্ঠে বললেন মিল ও কারখানা সবকিছু পরিদর্শন করুন। গুদামঘর পরিদর্শনের কোনো প্রয়োজন মনে হয় না।

মিঃ এরোমা লোদী বললেন–আমরা যখন মিঃ নসরের মিলকারখানা পরিদর্শন ব্যাপারে এসেছি তখন গুদাম বা গুদামঘর পরিদর্শনে আপনাদের কোনো আপত্তি থাকা ঠিক নয়।

ম্যানেজার সাহেব এবার ব্যস্তকণ্ঠে বললেন–না না, আমাদের কোনো আপত্তি নেই তবে ওসব গুদামঘরে তেমন কিছু নেই কিনা তাই……

বনহুর বললো–আমরা গোপন সুত্রে জানতে পেরেছি আলি নসর যে রাত্রিতে মৃত্যুবরণ করেন ঐ রাত্রিতে তিনি তার মিলকারখানার গুদামে এসেছিলেন এবং ফেরার পথে তার মৃত্যু হয়।

মিঃ এরোমা লোদী বললেন– হ্যাঁ কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি টেলিফোনে এই কথা পুলিশ অফিসে জানিয়ে ছিলেন। মিঃ আহসান আপনি কি করে জানলেন কথাটা?

পুলিস অফিসে যিনি টেলিফোন করেছিলেন তিনি সম্ভবতঃ আমাকে জনিয়েছেন, কাজেই আমার মনে হয় তার মৃত্যুর সঙ্গে কোন গভীর রহস্য এই মিল কারখানায় লুকিয়ে আছে। চলুন মিঃ লোদী……

মিঃ এরোমা লোদী এবং বনহুর ও ম্যানেজার মিঃ কাওসার মিঃ আলী নসরের মিল এবং কারখানা সবকিছু ঘুরেফিরে দেখলেন। তারপর এলেন কারখানার পেছনে গুদামঘরে। বৃহৎ আকার গুদামঘরে প্রবেশ করে বিস্মিত হলেন মিঃ এরোমা লোদী। যতই ভিতরে এগুচ্ছেন ততই দুচোখ তার ছানাবড়া হচ্ছে। একি কান্ড, স্তূপাকার শিশুখাদ্য নানাভাবে স্তরে স্তরে ঝুপ করে রাখা হয়েছে।

হঠাৎ গিয়েছেন পুলিশ সুপার ও তার সঙ্গীগণ মিল–কারখানা ও গুদামঘরে তাই কেউ একটুও জানে না কিছু। সবাই যে যার কাজে নিয়োজিত ছিলো সেইভাবেই আছে। কাজ চলছে, এমন অবস্থায় পুলিশ সুপারের আগমন সবাইকে হকচকিয়ে দেয়।

মিঃ আহসান–বেশী বনহুর সব কিছু জানে, জেনেও না জানার ভান করে মিঃ এরোমা লোদীর সামনে গুদামকক্ষে কর্মরত কর্মীদের নানা প্রশ্ন করে চলে।

. মিঃ এরোমা লোদী নিজেও উৎসাহী হলেন সব জানতে, কারণ অল্পক্ষণের মধ্যে তিনি জেনে নিলেন মিঃ আলী নসরের গুদামঘরের অভ্যন্তরে প্রচুর পরিমাণ শিশুখাদ্য গুদামজাত করে রাখা হয়েছে এবং সেইসব শিশুখাদ্যে ভেজাল মেশানো হচ্ছে।

মিঃ এরোমা লোদী বেশ বুঝতে পারলেন মিঃ আহসান চৌধুরী কেন তাকে এখানে হঠাৎ এমনভাবে নিয়ে এলেন। মিঃ লোদীর চোখ দিয়ে অগ্নিশিখা নির্গত হচ্ছিলো। তিনি ন্যায়পরায়ণ পুলিশ কর্মকর্তা। অন্যায় তিনি সহ্য করতে পারেন না। চাকরির মায়া তার নেই, সত্য এবং সততা তাঁর জীবনের লক্ষ্য।

এরোমা লোদী কর্মরত শ্রমিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করায় সবকিছু উদঘাটন হয়ে পড়লো। শুধু শিশুখাদ্যেই ভেজাল মেশানো হয় না, মিল–কারখানার আড়ালে আরও মূল্যবান ফুডের মধ্যে ভেজাল মেশানো হয় এবং সেইসব মালামাল অসৎ ব্যবসায়ীদের বহু অর্থের বিনিময়ে দেয়া হয়। এসব কাজ বহুদিন যাবৎ চলে আসছে। যার দরুণ আলী নসর লক্ষ লক্ষ নয়, কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে পড়েছিলেন।

বিশেষভাবে জেরা করতে গিয়ে উদঘাটন হয়ে পড়লো উক্ত রাতে আলী নসর তার নিজের গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন মিল–কারখানার গুদামঘরে এবং এখানে কয়েকজন উচ্চস্তরের ব্যবসায়ী অপেক্ষা করছিলেন। মিঃ লোদী আসার পর তার গোপন চেম্বারে বসে কিছু আলাপ–আলোচনা হয়। তারপর মালামাল দেয়ার জন্য কর্মচারীবৃন্দের ওপর দায়িত্বভার দিয়ে আলী নসর প্রায় এক কোটি টাকা ব্যাগে নিয়ে বিদায় গ্রহণ করেন। ঐ সময় তার সঙ্গে কোনো দেহরক্ষী প্রহরী ছিলো না।

মিঃ এরোমা লোদী মিঃ আহসানকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন–আপনার সহায়তায় এমন একটা গোপন রহস্য উদঘাটন হলো যে রহস্যময় স্থানে দেশ ও দেশের জনগণের মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার প্রচেষ্টা চলে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজ সহকারীকে পুলিশ অফিসে ফোন করে পুলিশ বাহিনীকে মিঃ আলী নসরের মিলকারখানায় আসার জন্য বলে দিলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ বাহিনী উপস্থিত হলো।

পুলিশপ্রধান মিঃ এরোমা লোদী তাদের নির্দেশ দিলেন, এই মুহূর্তে মিল–কারখানা এবং গুদামঘরে তালা লাগিয়ে দিতে এবং ম্যানেজার সহ মিল–

কারখানার সব কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করতে।

পুলিশ প্রধানের নির্দেশ পালন করলো পুলিশবাহিনী। আলী নসর সাহেবের পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবার সবাইকে গ্রাস করলো।

তালা লাগানো হলো স্বনামধন্য মন্ত্রীবর আলী নসর সাহেবের মিল–কারখানা এবং সমস্ত গুদামঘরগুলোতে।

তল্লাশি চালিয়ে বহু ভেজাল মেশানো শিশুখাদ্য এবং অন্যান্য গুদামজাত মালামাল আটক করা হলো। ফাস হয়ে পড়লো আলী নসরের সব গোপন রহস্য। ঐদিন রাতের অন্ধকারে অসৎ ব্যবসায়ীদের নিকট হতে ব্রাগভর্তি টাকা নিয়ে রওয়ানা দিয়েছিলেন আলী নসর কিন্তু তিনি আর বাসায় ফিরে যেতে সক্ষম হননি। তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে, সে মৃত্যু দারুণ বিস্ময়কর তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুরকে অনেক ধন্যবাদ জানালেন এবং তার সহায়তা কামনা করলেন হত্যারহস্য উদঘাটন ব্যাপারে মিঃ এয়োমা লোদী। মিঃ আহসান বেশী বনহুর বললো–মিঃ লোদী, আমি বলেছিলাম মিঃ আলী নসরের মৃত্যুরহস্য উদ্ঘাটনের কু পাওয়া যেতে পারে তার মিল–কারখানায়। এবার গোপন কাগজপত্র ঘেঁটে প্রকাশ পাবে কোন কোন স্বনামধন্য ব্যবসায়িগণ জড়িত ছিলেন বা আছেন মিঃ নসরের সঙ্গে এবং এ মৃত্যুর পেছনে তাদের ষড়যন্ত্র আছে বলে আমার ধারণা।

মিঃ আহসানের কথাগুলো মিঃ এরোমা লোদীর মনপুতঃ হলো এবং তিনি সেইভাবে অগ্রসর হলেন।

মিঃ এরোমা লোদী মিঃ আহসানসহ আলী নসরের মিলকারখানা এবং গুদামজাত মালামালের কাগজপত্র পরীক্ষা–নিরীক্ষা করে আলী নসরের সঙ্গে যেসব কারবারী–ব্যবসায়িগণ জড়িত ছিলেন সবাইকে খুঁজে বের করলেন এবং তাদের আটক করা হলো। কেউ পালাবার বা আত্মগোপন করবার সুযোগ পেলো না।

মিঃ এরোমা লোদী খুশি হলেন, মিঃ আলী নসরের মৃত্যুরহস্য উদঘাটন করতে গিয়ে সিংহাদেউড়ের বিরাট এক রহস্য উন্মোচিত হলো। শুধু তাই নয়, স্বনামধন্য মন্ত্রীবর কত বড় মহৎ ছিলেন তাও প্রকাশ পেলো।

মিঃ আলী নসরকে হত্যা করার অপরাধ এসে পড়লো তার সংগে জড়িত ব্যবসায়ীদের ওপর। তাদের প্রথম অপরাধ তারা কালো বাজারী, অসৎ ব্যবসায়ী, দ্বিতীয় অপরাধ তারা আলী নসরকে হত্যা করেছে বলে সন্দেহ করা হয় এবং সে কারণে তাদের গ্রেপ্তার শুধু করা হয় নি, তাদের মালামাল সব আটক করা হয়েছে।

আলী নসর হত্যা ব্যাপার নিয়ে সমস্ত সিংহাদেউড়ে আলোড়ন সৃষ্টি হলো। সিংহাদেউড় সরকারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মুখ কালো হয়ে উঠলো। অবশ্য যারা গোপনে সম্পত্তি এবং ব্যাংক ব্যালেন্স বৃদ্ধি করে চলেছিলেন তাদের মুখেই কালিমার ছাপ পড়লো। না জানি কখন কোন মুহূর্তে তাদের বিষয় আশয় সম্পত্তি এবং ব্যাংক ব্যালেন্সের হিসাব নিকাশ প্রকাশ হয়ে পড়ে। যারা সাধুতার মুখোশ পরে গদিতে সমাসীন থেকে দেশ ও জনগণের দরদী বন্ধু এবং হিতাকাঙ্ক্ষী রূপে জেঁকে বসে আছেন, এ মুহূর্তে তাঁদের বুকটা অজান্তে টিপ টিপ করে উঠলো।

মিঃ এরোমা লোদীকে কিভাবে দেশ থেকে তাড়ানো যায় এ ব্যাপারে গোপনে সলা–পরামর্শ চললো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে। পুলিশ সুপার একজন পুলিশ প্রধান আর স্বনামধন্য ব্যক্তিরা হলেন নেতা এবং দেশরক্ষক বলা চলে। তারা সর্বক্ষণ দেশের মঙ্গল চিন্তা করছেন। বিভিন্ন স্থানে সভা–সমিতি এবং বেতারে ভাষণ দিচ্ছেন যেন তাদের এক মাত্র চিন্তাধারা দেশ ও দশের মঙ্গল সাধন।

কিন্তু কিছুসংখ্যক ছাড়া প্রায় সবাই স্বার্থান্বেষী এবং দেশ ও দশের রক্ষক সেজে ভক্ষক। এরা বিড়াল তপস্বী বলা যায়। জনগণের চোখে ধুলো দিয়ে নিজেদের ভাগ্য গড়ে নিলেও একজন আছেন যার চোখে ধূলো দেয়ার সাধ্য কারও নেই। তার বিচারে কেউ রেহাই পাবে না–তিনি যেমন দয়ালু তেমনি কঠোর। তিনি সর্বশক্তিমান, তার বিচার বড় কঠিন। একটু ভালভাবে খেয়াল করলেই বুঝতে পারা যায় যারা নিজেদের স্বার্থে সাধুতার মুখোশ পরে মুখে বড় বড় বুলি আওড়ান, এ মুহূর্তে তারা জনমানবের শ্রদ্ধাঞ্জলি পেলেও একদিন তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবেই। গভীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যায় এর পরিণাম কত ভয়াবহ। অতীতের বহু ঘটনাই তার প্রমাণ।

সিংহাদেউড়ের অসৎ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ শুধু আসনচ্যুতই হলেন না তাদের কঠোর শাস্তিদান করা হলো।

বিষয় আশয় বাজেয়াপ্ত করা হলো, স্ত্রী–সন্তান পথে না বসলেও তারা দিশেহারা হলো। বিদেশে লেখাপড়া করতো যেসব সন্তান তাদের অর্থ বন্ধ হয়ে গেল। কাজেই চোখে ঘোলাটে দেখতে লাগলো স্বনামধন্য ব্যক্তিদের পরিবার–পরিজন। এমন যে ঘটবে তারা ভাবতে পারেনি।

ভেবেছিলো চিরদিন বুঝি এমনি করে জনগণের রক্ত শোষণ করে তাদের ইমারত গড়ে, উঠবে। সে ইমারত কোনোদিন ধসে পড়বে না কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস হঠাৎ করে এমনভাবে আকাশ ভেঙে মাথায় পড়বে তা তারা জানতো না।

এটা যে দুনিয়ার নিয়ম।

অন্যায় যত গোপন করেই রাখা যাক না কেন, একদিন তা প্রকাশ পাবে এবং তার প্রতিফলও হবে সঙ্গে সঙ্গে।

মিঃ আলী নসরের অসৎ কর্মের ফলাফল উদঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে আরও যারা মিথ্যা এবং অসৎ কর্মে লিপ্ত নেতৃস্থানীয় স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন তাদের মালামালের হিসোব বেরিয়ে পড়লো। এক একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি শুধু ধনকুবেরই নয়, তারা ইহকালের পথ চিরকালের জন্য সুগম করে নিয়েছেন, চৌদ্দ পুরুষ যেন অন্নের সংস্থানে হন্যে না হয় তার সুব্যবস্থা করে যাচ্ছেন এরা।

সিংহাদেউড়ের কিছু সংখ্যক সৎ এবং মহৎ ব্যক্তি যারা সত্যিই দেশ ও দশের জনগণের জন্য ভাবেন তারা নেহাতই মুষ্টিমেয়। তারা নেতৃস্থানীয় আসনে সমাসীন থেকেও কোনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন না। যেমন গাড়ি আছে, তা সরকারের কাজ ছাড়া কোনোমতেই নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করেন না। নিজের ভাতা ছাড়া একটি পয়সাও তাদের হাতে আসে না অসৎ উপায়ে তাদের নেই তেমন কোনো ইন্ডাস্ট্রি বা মিল–কারখানা। ইমারত বা ঐশ্চর্যের প্রাচুর্যে ভরে ওঠেনি তাদের বালাখানা। এমন নেতাও আছেন যারা শুধু ইহকালের পথই সুগম করছেন না, পরকালের পথও সুগম হচ্ছে তাদের জন্য। হয়তো বা ইহকালে লোকসমাজ তাদের জৌলুস নগণ্য মনে হবে কিন্তু তারাই হলেন বিশ্বাসবাসীর শ্রদ্ধার পাত্র। চির অক্ষয় তাদের পরিণাম, চিরস্মরণীয় তারা।

বনহুর শ্রমিকের বেশে যেতো বস্তি এলাকায়। তাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করতো সেবাযত্ন এবং অর্থ দিয়ে। বৃদ্ধার ঘরের চালা ভেঙে নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। বনহুর নিজের হাতে দুজন শ্রমিকের সাহায্যে আবার সে ভাঙা ঘর গড়ে নতুন

করে দিলো। শুধু ঘর মেরামতই নয় বৃদ্ধার যেন কোনো অসুবিধা না হয় এ কারণে তার নামে ব্যাংকে কিছু মোটা অর্থ রেখেছিলো সে এবং এমন ব্যবস্থা করলো যেন মাসে সে ব্যাংকে গিয়ে প্রয়োজনীয় অর্থ তুলে এনে খরচ করতে পারে।

বৃদ্ধার দুচোখে অশ্রুর বন্যা ঝরে পড়ে।

বনহুরকে সে নিজের সন্তান মনে করে। এমন কাউকে সে আজও দেখেনি যে অপরের জন্য এমনভাবে নিজকে বিলিয়ে দিতে পারে।

শুধু বৃদ্ধাই নয়, বস্তির সবাই বনহুরকে ভালবেসে ফেললো। সপ্তাহে সে একদিন অবশ্যই বস্তি এলাকায় যেতো এবং সবার দুঃখ ব্যথা বেদনা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতো। দুহাত ভরে দান করতো সে সবার মধ্যে। সিংহাদেউড়কে তার নিজের দেশ মনে করতো, গোটা বিশ্ব তার দেশ–সারা বিশ্ববাসী তার আপন জন।

একদিন বনহুর শ্রমিকের বেশে কোনো এক অসুস্থ শ্রমিককে হসপিটালে পৌঁছে দিচ্ছিলো। ঘোড়ার গাড়ি থেকে কাঁধে ভর দিয়ে নামিয়ে হসপিটালের দিকে এগুচ্ছিলো বনহুর।

ঐ মুহূর্তে মিঃ এরোমা লোদী তার গাড়ি নিয়ে সেই পথে যাচ্ছিলেন হঠাৎ দৃষ্টি তার স্থির হলো শ্রমিকবেশী বনহুরের মুখে। পুলিশপ্রধানের চোখ এড়াতে পারলো না বনহুর, সে ধরা পড়ে গেলো।

বনহুর লক্ষ্য করলো মিঃ লোদীকে, সে বুঝতে পারলো মিঃ লোদী তাকে চিনতে পেরেছেন, কাজেই আর আত্মগোপন করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

অসুস্থ শ্রমিককে হসপিটালে পৌঁছে দিয়ে বনহুর বৃদ্ধার কুটিরে গেলো, তার কাছে বিদায় নিয়ে ফিরে এলো বনহুর হোটেল শাহী এলুনে।

এখন তার শরীরে মূল্যবান কোট-প্যান্ট-টাই। ঠোঁটের ফাঁকে অর্ধদগ্ধ সিগারেট, ব্যাগটা গুছিয়ে নিচ্ছিলো সে।

এমন সময় মিঃ এয়োমার গাড়ি এসে থামলো হোটেল শাহী এলুনের সম্মুখে।

মিঃ এরোমা লোদী যখন ওপরে উঠে এলেন তখন ১০৩ নং রুম তালাবদ্ধ।

মিঃ এরোমা লোদী বয়কে জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারলেন উক্ত রুমের ভদ্রলোক কিছুক্ষণ পূর্বে হোটেলের চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেছেন।

মিঃ এরোমা লোদী কিছু ভাবলেন, তারপর রুম খুলে ভেতরে প্রবেশ করলেন। তিনি দেখলেন টেবিলে এ্যাসট্রের নিচে চাপা দেয়া আছে একটি লাল কাগজ।

কাগজখানা হাতে তুলে নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরলেন মিঃ এরোমা লোদী। সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন তিনি–দস্যু বনহুর।

মিঃ লোদীর সহকারী বিস্ময়ভরা চোখে তাকালেন মিঃ এরোমা লোদীর মুখের দিকে–স্যার, দস্যু বনহুর কে? কোথায় সে?

মিঃ এরোমা লোদী বললেন–মিঃ আহসান চৌধুরী স্বয়ং দস্যু বনহুর। তিনি চলে গেছেন আজ বিদায় নিয়ে।

এরোমা লোদী এবং তাঁর সহকারী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইলেন লাল কাগজখানার দিকে।

বনহুর তখন কান্দাইয়ের পথে রওয়ানা দিয়েছে।

গাড়িতে বসে তাকিয়ে আছে সে সিংহাদেউড়ের রাজপথের দুপাশে সারিবদ্ধ পাইনগাছগুলোর দিকে।

পথের দুপাশের পাইন গাছগুলো মাথা দুলিয়ে তাকে যেন অভিনন্দন জানাচ্ছে।

[পরবর্তী বই অন্ধকারের আতঙ্ক]

পূর্ববর্তী:

« ৭.১৯ হীমাগারে দস্যু বনহুর

পরবর্তী: